لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

পাক্ষিক আহ্‌মদী

THE AHMADI

Fortnightly

নব পর্যায়ে ৫৫তম বর্ষ ।। ১৯শ সংখ্যা

৩রা যিলকদ, ১৪১৪ হিঃ ।। ২রা বৈশাখ, ১৪০১ বঙ্গাব্দ ।। ১৫ই এপ্রিল, ১৯৯৪ইং

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ ৭২.০০ টাকা ।। ভারত ২ পাউণ্ড ।। অন্যান্য দেশ ১৫ পাউণ্ড ।।

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহমদী ১৯তম সংখ্যা (৫৫তম বর্ষ)

পৃঃ

তরজমাতুল কুরআন (তফসীরসহ)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন মজীদ থেকে ১

হাদীস শরীফ ঃ
অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ মাওলানা সালেহ আহমদ, সদর মুরব্বী ৩

অমৃত বাণী ঃ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)
অনুবাদ ঃ জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া ৪

জুমুআর খুতবা
হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ) ১০
অনুবাদ ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরব্বী

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মতামত ঃ
ধর্মরাষ্ট্র গঠনের কল্পবিলাস কাদিয়ানী সমস্যার অভিজ্ঞতা ১৯
পাখির চোখে দেখা ২৪
দলিল প্রমাণ ছাড়া আমাদের অমুসলিম হিসেবে ফতোয়া দিচ্ছে ২৭
কাদিয়ানী বিরোধিতার নামে দেশে হাঙ্গামা বাধানোর চেষ্টা হচ্ছে ২৯
ওরা দেশে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিতে চায় ৩১
আহমদিয়া সম্প্রদায়ের জানমালের নিরাপত্তা বিধানের আহ্বান ৩২
বিশেষ সাক্ষাতকারে কাদিয়ানী নেতা ৩৩
একটি সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী দেশে দাঙ্গা বাঁধানোর অপচেষ্টা চালাচ্ছে ৩৪
খতমে নবুওয়ত মৌলবাদী শক্তি ঃ আহমদীয়া জামাত ৩৫
কাদিয়ানী ইস্যুকে নির্বাচনী ইস্যু করার চেষ্টা চলছে ৩৬
কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করা অসাংবিধানিক ৩৭
ছোটদের পাতা
পরিচালক ঃ জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান ৩৯
সংবাদ ৪১
আসহাবে কাহাফের পাতা—আররকীম ৪৩
সম্পাদকীয় ঃ ৪৯

নতুন শতাব্দীর শুভেচ্ছা

নববর্ষ ও নতুন শতাব্দী উপলক্ষ্যে আমরা আমাদের অগণিত পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীগণকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। আগামী শতাব্দী বাংলা ভাষা-ভাষী সকলের জন্যে বয়ে নিয়ে আসুক অনাবিল আনন্দ ও অকৃত্রিম সুখ।

পাক্ষিক আহমদী ব্যবস্থাপনা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

৫৫তম বর্ষ : ১৯তম সংখ্যা

১৫ই এপ্রিল, ১৯৯৪ : ১৫ই শাহাদত, ১৩৭৩ হিঃ শামসী : ২রা বৈশাখ, ১৪০১ বঙ্গাব্দ

তরজমাতুল কুরআন
সূরা আলে ইমরান-৩

৪৭। এবং সে দোলনায় (৪১৮-ক) এবং প্রৌঢ়াবস্থায় (৪১৮-খ) লোকদের সহিত কথা বলিবে এবং সৎকর্মপরায়ণগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

৪১৮-ক। 'মাহ্‌দ' শব্দের প্রাথমিক অর্থ হইল প্রস্তুতির সময় বা অবস্থা, যখন কোনও ব্যক্তি সুন্দর ও পরিপাটিরূপে পূর্ণ বয়সে কার্য সম্পাদনের জন্য প্রস্তুতি নিতেছে। 'কাহল' ও মাহদ শব্দ দুইটি একই সাথে ব্যবহৃত হওয়া দ্বারা বুঝা যায়, এই দুইটি সময়ের মাঝখানে কোন মধ্যবর্তী সময় নাই। 'কাহল' (মধ্যম বয়স) এর পূর্বেকার সাকল্য সময়টুকুই 'মাহ্‌দ' (প্রস্তুতি-সময়)।

৪১৮-খ। 'কাহ্‌ল' মানে মধ্যম বয়স, অথবা সেই বয়সে যে বয়সে কাঁচা চুলের সাথে পাকা চুল মিশ্রিত হইতে থাকে; ত্রিশ-চৌত্রিশ বৎসর বয়স্ক হইতে একান্ন বৎসর বয়স্ক হওয়ার সময় বা চল্লিশ হইতে একান্ন বৎসর বয়সের সময়কাল (লেইন ও সালাবী)।

ঈসা (আঃ) অতি শিশুকালেই জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন কথা বলিতেন, ইহা আশ্চর্যজনক বা অপ্রাকৃতিক নহে। বহু মেধাবী, ধীমান শিশু যাহারা সুপরিবেশে, সযত্নে লালিত হয়, তাহাদের মাঝেও এই প্রতিভা দৃষ্টি গোচর হয়। সমস্ত বাক্যটির অর্থ ইহাই যে, তিনি শিশু, কিশোর-যৌবনে এবং মধ্যম বয়সে এমন অসাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন কথাবার্তা বলিতেন, যাহা তাঁহার বয়স ও অভিজ্ঞতার তুলনায় অধিকতর উচ্চ স্তরের। ঈসার জীবনের দুইটি বয়ঃক্রম কালের উল্লেখ এই কথার প্রতিও ইঙ্গিত করিতে পারে যে, তাঁহার দ্বিতীয় বয়ঃক্রম (কাহ্‌ল) কালের কথা প্রথম বয়ঃক্রম (মাহ্‌দ) কালের কথা হইতে ভিন্ন প্রকৃতির হইবে। তখন তিনি মানুষের কাছে নবীরূপে কথা বলিবেন। অতএব, মরিয়মকে যে সুসংবাদগুলি আল্লাহ্‌তা'লা দিয়াছিলেন, তাহা আসলে এই ছিল যে, তাঁহার পুত্র শুধু যে বুদ্ধিতেজোদ্দীপ্ত জ্ঞানী ব্যক্তি হইবেন তাহাই নহে, বরং তিনি একজন উচ্চ পর্যায়ের ধার্মিক, আল্লাহ্‌র মনোনীত ব্যক্তিত্ব হিসাবে দীর্ঘজীবনও লাভ করিবেন।

৪৮। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু! কীরূপে আমার সন্তান হইবে যখন কোন মানুষ আমাকে স্পর্শ (৪১৯) করে নাই নাই'? তিনি বলিলেন, 'এই ভাবেই, আল্লাহ্ যাহা চাহেন সৃষ্টি করেন, যখন কোন বিষয় তিনি ফয়সালা করেন তখন উহার সম্বন্ধে তিনি শুধু বলেন, 'হও', উহা হইয়া যায়;

৪১৯। পুত্র প্রাপ্তির সংবাদ যদিও অত্যন্ত সুখকর বিষয়, তথাপি অবিবাহিতা মরিয়মের জন্য ইহা ছিল এক বিব্রতকর ব্যাপার। কেননা, তাঁহার জীবন তো ভবিষ্যতেও অবিবাহিত থাকার জন্যই নিবেদিত ও নির্দ্ধারিত। এই আয়াত তাঁহার মনের হতবুদ্ধি অবস্থাকে যুক্তিযুক্ত সাব্যস্ত করিতেছে। এই আয়াত দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় যে, ঈসা (আঃ)-এর কোনও পিতা ছিল না; মরিয়মের উক্তি 'কোন মানুষ আমাকে স্পর্শ করে নাই' বাক্যের মধ্যেই তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায়। মরিয়মের সম্পূর্ণ জীবন উপাসনালয়ের নামে উৎসর্গীকৃত থাকায় এবং ভবিষ্যতে বিবাহ করা উৎসর্গীকৃত জীবনের সাথে সঙ্গতিহীন হওয়ায়, তাহাকে সন্ন্যাসিনী হইয়া থাকিতে হইবে। যদি তাহা না হইত এবং তাঁহার বিবাহের সম্ভাবনার কথা তাঁহার চিন্তায় কখনও আসিত, তাহা হইলে তিনি পুত্র সন্তান প্রাপ্তির ভবিষ্যত সংবাদ ফিরিশ্‌তা হইতে অবগত হইয়া আশ্চান্বিত হইতেন না। 'মরিয়মের সুসমাচারে' আমরা মরিয়মের কুমারী ব্রতের প্রতিজ্ঞার কথা স্পষ্টাক্ষরে দেখিতে পাই। উক্ত সুসমাচারের পঞ্চম অধ্যায়ে আছে: উপাসনালয়ের প্রধান পুরোহিত সাধারণ হুকুম জারি করিলেন যে, উপাসনালয়ে বসবাসকারী যেসকল কুমারী মেয়ের বয়স চৌদ্দ বৎসর হইয়াছে, তাহারা বাড়ীতে ফিরিয়া যাইবে। সকল কুমারীই এই আদেশ পালন করিল। কিন্তু 'প্রভুর কুমারী মরিয়ম' একমাত্র মেয়ে যিনি উত্তর দিলেন যে, তিনি এই আদেশ পালনে অসমর্থ, কেননা তিনি এবং তাঁহার পিতা মাতা তাঁহাকে প্রভুর সেবায় উৎসর্গ করিয়াছেন। তাছাড়া তিনি প্রভুর নিকট কুমারীত্ব পালনের শপথ নিয়েছেন, যাহা তিনি কোন অবস্থায়ই ভঙ্গ করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতিবদ্ধ (মরিয়মের সুসমাচার ৫:৪, ৫, ৬) পরবর্তীকালে যোসেফের সহিত তাঁহার বিবাহ, তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং তাঁহার শপথের বিরুদ্ধে, তাঁহার উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ছেলের মা হওয়ার কারণে অবস্থার চাপে পড়িয়া তিনি বাধ্য হইয়াছিলেন এবং যাজকেরা দুর্নাম হইতে বাঁচিবার জন্যই এই বিবাহের আয়োজন করিয়াছিল। সুসমাচার হইতে এই কথা বুঝা যায় না যে, যোসেফকে এই বিবাহে কীভাবে সম্মত করা হইয়াছিল। তবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, মরিয়ম ঐ সময়ে সন্তান-সম্ভবা তাহা যোসেফ মোটেই জানিতেন না (মথি-১:১৮-১৯)। সম্ভবতঃ মরিয়মের শপথ ভঙ্গের কোন একটা যুক্তি গ্রাহ্য বাহানা আবিস্কার করা হইয়াছিল।

হাদিস শরীফ

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : মাওলানা সালেহ আহমদ,
সদর মুরব্বী

কুরআন :

ان الصوٰة تنهى عن الفحشاء والمنكر (سورة العنكبوت ايت ٤٥)

অর্থ : নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও মন্দকার্য হতে বিরত রাখে।

(সূরা আনকাবূত আয়াত ৪,৬)

হাদীস :

عن ابى هريرة رضى الله عنه سمعت رسول الله صلعم يقول أرايتم لو أن نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم خمسا - ماتقول ذلك يبقى من درنه ؟ قالوا لايبقى من درنه شيأ - قال فذلك مثل الصوات الخمس يمحوا الله بها الخطايا

(البخارى كتاب مواقيت الصوة)

অর্থাৎ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, তোমরা বলো তো দেখি কারও ঘরের সামনে দিয়ে যদি কোন নদী প্রবাহিত হয় এবং সে তাতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে তাহলে কি তার (দেহে) কোন ময়লা থাকতে পারে ? - সাহাবীগণ (রাঃ) বললেন, "না, ময়লা থাকতে পারে না"। তিনি (সাঃ) বললেন, "পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও তদ্রূপ। আল্লাহ্তালা ইহা দ্বারা সমস্ত দোষত্রুটি মিটিয়ে ফেলেন"। (বুখারী-কিতাব মওয়াক্কিতুস সালাত)।

ব্যাখ্যা :

উপরোক্ত হাদীসে আল্লাহ্র রসূল (সাঃ) আমাদিগকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের তাৎপর্য বর্ণনা করে নামাযের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। খোদা স্বয়ং বলেন যে, প্রকৃত নামায মানুষকে অশ্লীল কর্ম হতে বিরত রাখে। এবং খোদার রসূল (সাঃ) বলছেন—প্রকৃত নামায আদায় করলে আল্লাহ্তা'লা আমাদের দোষ-ত্রুটি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দেন।

আল্লাহ্তা'লা ও তাঁর রসূল (সাঃ)-এর এত স্পষ্ট বর্ণনা থাকা সত্ত্বেও অনেকেই নামায হতে গাফেল, এবং অনেকেই এমনও রয়েছেন যে, নামাযও পড়েন ও অশ্লীল অথবা মন্দ কার্যেও লিপ্ত থাকেন। প্রকৃত নামায আদায়কারী কখনও মন্দকর্মে লিপ্ত হতে পারে না ইহাই খোদার ফয়সালা। এই চিহ্ন দ্বারা আমরা আমাদের নামায যাচাই করতে পারি যে আমরা সত্যিকার অর্থে নামায পড়ি কি না ? যেভাবে প্রতি দিন পাঁচ বার গোসল করলে শরীরে ময়লা থাকতে পারে না অনুরূপ পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিষ্ঠার সাথে আদায়কারীর হৃদয়েও কোন ধরনের গুনাহর ছাপ থাকতে পারে না। প্রকৃত নামায সম্বন্ধে আল্লাহ্র

(অবশিষ্টাংশ ৫ম পাতায় দেখুন)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

অনুবাদ : নাজির আহমদ ভূঁইয়া

(১৬-১৭শ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

অতঃপর যে অবস্থায় এই বিষয়টি প্রকাশ্য ও স্বতঃসিদ্ধ যে, হযরত ঈসা আলায়হেস সালামকে ঐ পরিমাণ আধ্যাত্মিক শক্তি ও সামর্থ্য দান করা হইয়াছিল যাহা ইহুদী ফেরকার সংশোধনের জন্য যথেষ্ট ছিল, তবে নিঃসন্দেহে তাঁহার গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যও ঐ প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটেই হইবে, যেমন আল্লাহ্‌তা'লা বলেন,

وان من شئ الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم (সূরা আল্‌ হিজর, আয়াত ২২)। অর্থাৎ আমার নিকট সব বস্তুর ভাণ্ডার রহিয়াছে। কিন্তু আমি ঐগুলিকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অবতীর্ণ করি না। অতএব ইহা ঐশী প্রজ্ঞার পরিপন্থী যে, একজন নবীকে উম্মতের সংশোধনের জন্য ঐ সকল জ্ঞান দেওয়া হইবে যে জ্ঞানের সহিত ঐ উম্মতের সামঞ্জস্যই নাই। বরং পশুদের মধ্যেও খোদাতা'লার এই বিধানই দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ঘোড়াকে এই উদ্দেশ্যে খোদা সৃষ্টি করিয়াছেন যে, দূরত্ব অতিক্রম করার ক্ষেত্রে ইহা উত্তম কাজ দিবে এবং সে ময়দানে দৌড়ানোর সময় নিজ আরোহীর সহায়ক ও সাহায্যকারী হইবে। এইজন্য একটি ছাগল এই সকল গুণের ক্ষেত্রে ইহার মোকাবেলা করিতে পারে না, কেননা ইহাকে এই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয় নাই। অনুরূপভাবে খোদা পানিকে পিপাসা নিবারণের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। এইজন্য আগুন ইহার স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে না। মানব প্রকৃতি অনেক শাখার সমন্বয়ে গঠিত এবং ইহাতে খোদা বিভিন্ন ধরনের শক্তি রাখিয়াছেন। কিন্তু বাইবেল কেবলমাত্র একটিই শক্তি—ক্ষমার গুণের উপর জোর দিয়াছে, যেন মানব-বৃক্ষের শত শত শাখার মধ্য হইতে কেবল একটি শাখাই বাইবেলের হাতে আছে। অতএব ইহা দ্বারা হযরত ঈসার কতখানি তত্ত্বজ্ঞান ছিল ইহার তাৎপর্য অবগত হওয়া যায়। কিন্তু আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের তত্ত্বজ্ঞান মানব প্রকৃতির শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছিয়া গিয়াছে। এইজন্য কুরআন শরীফ পরিপূর্ণ আকারে অবতীর্ণ হইয়াছে এবং ইহাতে খারাপ কিছু ভাবিবার কারণ নাই। আল্লাহ্‌-তা'লা নিজেই বলেন, تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض (সূরা আল্‌ বাকারা— আয়াত ২৫৪)। অর্থাৎ কোন কোন নবীকে আমি কোন কোন নবীর উপর দাসত্ব দান

করিয়াছি এবং আমাদিগকে সকল কাজে, সকল আচরণে এবং সকল উপাসনালয় আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অতএব যদি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য প্রতিচ্ছায়ারূপে অর্জন করার ক্ষমতা আমাদের প্রকৃতিতে না দেওয়া হইত তবে এই আদেশ আমাদিগকে কখনো দেওয়া হইত না যে, এই সম্মানিত নবীর অনুসরণ কর। কেননা খোদাতা'লা ক্ষমতার বাহিরে কোন কষ্টকর বোঝা চাপান না, যেমন তিনি নিজেই বলেন, لا يكلف الله نفسا الا وسعها (সূরা আল্ বাকারা—আয়াত ২৮৭)। (অর্থঃ—আল্লাহ্ কোন ব্যক্তির উপর তাহার সাধ্যাতীত কষ্টকর দায়িত্বভার ন্যস্ত করেন না—অনুবাদক)। যেহেতু তিনি জানিয়েছেন যে, সকল নবীর সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মধ্যে সমাবেশ ঘটিয়াছে, যেহেতু তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে আপনাদিগকে এই দোয়া পড়ার নির্দেশ দিয়াছেন اهدنا الصراط المستقيم ٥ صراط الذين انعمت عليهم অর্থাৎ হে আমাদের খোদা! আমাদের পূর্বে যে সকল নবী, রসূল, সিদ্দীক ও শহীদ চলিয়া গিয়াছেন তাহাদের সকলের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য আমাদের মধ্যে সন্নিবেশিত কর। অতএব এই মর্যাদাবান উম্মতগণের উচ্চমার্গের প্রকৃতি সম্পর্কে ইহা দ্বারা আন্দাজ করা যায় যে, তাহাদিগকে অতীতের সকল প্রকারের গুণ ও বৈশিষ্ট্য নিজেদের মধ্যে সমাবেশ করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহাতো সাধারণ নির্দেশ। ইহা হইতে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সম্পর্কে অবগত হওয়া যাইতে পারে। এই কারণেই এই উম্মতের জ্ঞানী-গুণী সুফীগণ এই গোপন সত্যে পৌঁছিয়া গেলেন যে, মানব-প্রকৃতির পরিপূর্ণতার (চরম উৎকর্ষ সাধনের) পরিধি এই উম্মতই পূর্ণ করিয়াছে। ব্যাপারটি এই যে, যেভাবে একটি বীজকে মাটিতে বপন করা হয় এবং ধীরে ধীরে ইহা নিজ পরিপূর্ণতায় পৌঁছিয়া একটি বড় বৃক্ষে পরিণত হয়, সেভাবে মানব জাতি উন্নতি সাধন করিতে থাকে এবং মানবীয় শক্তি স্বীয় পূর্ণতায় অগ্রসর হইতে থাকে এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের যুগে ইহা স্বীয় পূর্ণত্বের শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছিয়া গেল। (ক্রমশঃ) (হাকীকাতুল ওহী পুস্তকের ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ)

(৩য় পাতার পর)

রসূল (সাঃ) বলেছেন যে, নামায এভাবে আদায় করো যেন তোমরা খোদাকে দেখছো, আর এরূপ না হলে অন্ততঃ এতটুকু ভাবো যে, খোদাতা'লা তোমাকে দেখছেন। আমরা যদি এ ধরনের ধ্যানে মগ্ন হয়ে নামায আদায় করি তাহলে আমরা প্রকৃতভাবে নামাযী হতে পারবো। নতুবা খোদার ফরমান রয়েছে অভিসম্পাত ঐ সকল নামাযীদের জন্যে যারা নামায হতে গাফেল।

আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) জামাতকে বার বার খোদার ইবাদতের দিকে ডাকছেন এবং আহ্বান জানাচ্ছেন যে, আমরা যেন খোদার যিকিরে রত হয়ে যাই আর খোদার যিকিরের উত্তম পন্থা হলো নামায যা বিগলিত চিত্তে খোদার দর্শন উপলব্ধি করতঃ আদায় করার মধ্যেই নিহিত। আল্লাহ্ করুন আমরা যেন সকলে খোদা ও তাঁর রসূল (সাঃ)-এর ফরমানের উপর আমল করে গুনাহ হতে মুক্ত হতে পারি। আমীন।

চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের প্রতিশ্রুত নিদর্শনদ্বয়ের অন্তর্নিহিত রহস্য ও উহার প্রতিফলন

"প্রত্যেক সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের দ্বারা (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) সতর্কীকরণই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। যেমন, হাদীসাবলীতে সে দিকেই ইঙ্গিত করার জন্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে প্রত্যেক সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের সময় নামায পড়, ইস্তেগ্‌ফারে রত থাক এবং সদকা দাও।" (আঞ্জামে আথম, পৃঃ ৩৩৫)

"সুতরাং বুখারী (মিশরে মুদ্রিত সংস্করণের ১২২ পৃষ্ঠায়) লিপিবদ্ধ আছে:

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یخوف بھما عبادہ

(অর্থাৎ—"চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের দ্বারা আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে থাকেন।) আল্লাহতা'লা বলেন: وما نرسل بالایات الا تخویفا (অর্থাৎ—ভীতি প্রদর্শন ব্যতীত অন্য কোনও উদ্দেশ্যে আমরা নিদর্শনাবলী প্রেরণ করি না।"—সূরা বনী ঈস্রাঈল-৬০)।

(আঞ্জামে আথম, পৃঃ ৩৩৫-পাদটীকা)

"ঈসা মসীহ্‌র নবম বিশেষত্ব এই ছিল যে, যখন তাকে ক্রুশে চড়ানো হয়েছিল তখন সূর্য গ্রহণ লেগেছিল। এই ঘটনায় খোদা আমাকেও অংশীদার করেছেন। কেননা যখন আমাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রত্যাখ্যান করা হল, তৎপর কেবলমাত্র সূর্যেই নয় বরং রমযান মাসে চন্দ্রেও গ্রহণ লেগেছিল এবং ইহা (উভয় গ্রহণ রমযান মাসে) একবার ঘটে নাই, বরং হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী (পরবর্তী বছর পশ্চিম গোলার্ধে) দ্বিতীয়বার ঘটেছিল। এই গ্রহণ সম্বন্ধে ইঞ্জিলেও সংবাদ দেয়া হয়েছিল এবং কুরআন করীমেও এই সংবাদ রয়েছে। আর তেমনি হাদীসেও রয়েছে। যেমন, হাদীসগ্রন্থ 'সুনান দারকুতনী'তে এই সংবাদ রয়েছে।

দশম বিশেষত্ব এই যে, ঈসা মসীহকে কষ্ট দেওয়ার পর ইহুদীদের মধ্যে ভয়ঙ্কর প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। সুতরাং আমার সময়েও ভয়ঙ্কর প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে।"

(তাযকেরাতুশ শাহাদাতাইন)

"আমি আমার রচিত 'নূরুল হক' পুস্তকে লিখেছিলাম যে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ দেখার পর ঐ সব লোক যারা (প্রত্যাখান করা হ'তে) তওবা করবে না তাদের উপর আল্লাহ্‌র আযাব অবতীর্ণ হবে।..... সুতরাং তদ্রূপই হয়েছিল। চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের পর এদেশের অধিকাংশ অবজ্ঞাকারীদের উপর প্লেগ পাঠানো হয় এবং প্লেগের প্রকোপে সহস্র সহস্র মানুষ মারা যায়। অবজ্ঞাকারীদের উপর অগ্নিশিখার ন্যায় উহা পতিত হয়। যার ফলে তারা মারা যায় এবং গ্রাম-গঞ্জ ও শহরগুলো হতে বহিষ্কৃত হয়।"

(নাজমুল-হুদা, পৃঃ ১২১, ১২২)

"চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণকে ইমাম মাহ্‌দীর সত্যতার চিহ্ন স্বরূপ কেন নির্ধারণ করা হলো? বস্তুতঃ ইহা এই ইঙ্গিত বহন করে যে, ভূ-পৃষ্ঠে তাঁর অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান ঐশী-ক্রোধ উদ্রেকের কারণ হবে। তাই উহার পর পৃথিবীতে সেই ঐশী-ক্রোধ প্লেগের প্রকোপের আকারে প্রকাশিত হলো। মোট কথা, আল্লাহ্‌তা'লা সতর্কীকরণ ও স্মরণ করানোর উদ্দেশ্যে আকাশে উহার নমুনা বা প্রতীক চিহ্ন স্থাপন করতে চাইলেন। আর সেজন্যে চন্দ্র ও সূর্যের উভয় গ্রহণকে বেছে নিলেন। কেননা সূর্যের রাজত্ব হচ্ছে দিবসের উপর এবং চন্দ্রের রাজত্ব রাত্রির উপর। তেমনি ধারায় এই প্রতিশ্রুত পুরুষ ইমাম মাহ্‌দীকে উভয় রাজত্বের আধিপত্য দান করা হয়েছে, অর্থাৎ ইসলাম-ধর্ম, যা দিবস তুল্য এবং অপরাপর ধর্ম, যা রাত্রতুল্য—এই উভয় ক্ষেত্রে ("ন্যায় বিচারক-মিমাংসাকারী"রূপে) রাজত্ব (সুলভ বিশেষ ভূমিকা পালন) করার জন্যে এই প্রতিশ্রুত পুরুষের আগমন। অতএব তাঁর দিবাতুল্য রাজত্বেও প্রতিবন্ধকতা ও আবরণ সৃষ্টি করা হয়েছে। তেমনি রাত্রিতুল্য আমলদারীতেও। এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌তা'লার মহাপ্রজ্ঞা ইহাই চেয়েছে, আকাশে যেন তিনি চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের নিদর্শন সতর্কীকরণের ভীতিপ্রদ নমুনাস্বরূপ উপস্থাপন করেন।"

(নুযূলুল মসীহ)

"ইহাও অনুধাবন কর যে, প্রত্যেক ঐশী নিদর্শনের মধ্যে এক গুঢ় রহস্য নিহিত থাকে। অতএব, আমরা বর্ণনা করে এসেছি, চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের মাঝে এ রহস্যই নিহিত ছিল যে, ইহার দ্বারা যেন উলামাদের অন্ধকারপূর্ণ অবস্থার চিত্র, যা অস্বীকার ও প্রত্যাখানের কারণে তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে গেছে তা আকাশে প্রদর্শিত হয়। আকাশে দৃশ্যমান চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ ছিল (প্রকৃতপক্ষে) ওলামাদের (আধ্যাত্মিক) রাহুগ্রস্থতার প্রতিবিম্বন ও প্রতিফলনস্বরূপ। পূর্বকাল থেকেই সংবাদ দেয়া হয়েছিল যে, ওলামা এই অঙ্গীকৃত মাহ্‌দীকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করবে এবং তারা হবে ভূ-পৃষ্ঠে সবার চেয়ে নিকৃষ্ট। কাজেই তদ্রূপ সংঘটিত হওয়াই অবধারিত ছিল। সুতরাং আলেমরা সেরূপ জোরে-শোরেই অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করেছে যেরূপ আহাদীস-নববী ও আ'সারে (অতীত কালের ইসলামী গ্রন্থাবলীতে) পূর্ব থেকে লিপিবদ্ধ ছিল। ঐ যাবতীয় ভবিতব্যই পূর্ণ হয়েছে। আর তদনুযায়ীই তাদের ঈমানী আলো আল্লাহ্‌ কেড়ে নিলেন। যার ফলে তাদের অন্তঃকরণে অস্বীকার ও কুফরী ফতওয়া জনিত আঁধারের গ্রহণ লেগে গেল। তৎপর তাদের এই গ্রহণরূপ অবস্থার উপর সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে আকাশে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ (নিদর্শন স্বরূপ) সংঘটিত হলো। এই কারণ বশতঃই উক্ত গ্রহণদ্বয় ভীতিপ্রদ নিদর্শন বিশেষ। বস্তুতঃ প্রত্যেক চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের দ্বারা সতর্কীকরণ ও ভীতি প্রদর্শনই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। যেমন হাদীসাবলীতে সে দিকেই ইঙ্গিত করার জন্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের সময় নামায

পড়, ইস্তেগফারে রত হও এবং সদকা দাও।" (যমীমা আঞ্জামে আথম-রূহানী খাযায়েন ১১ খণ্ড, পৃঃ ৩৩৫)

"এস্থলে আল্লাহ্‌তা'লা রমযান মাসে সংঘটিত চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণকেই কেন প্রতিশ্রুত মাহদীর নিদর্শনস্বরূপ নির্ধারণ করলেন? এর হিকমত ও গুঢ় রহস্য বর্ণনা করাও (অপ্রাসঙ্গিক ও) নিষ্ফল হবে না।

অতএব জানা উচিত, খোদাতা'লা জ্ঞাত ছিলেন যে, ওলামা-এ-ইসলাম মাহদীকে অস্বীকার করবে এবং তাঁর বিরুদ্ধে কুফরী ফতওয়া জারী করবে। এ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী আ'সার ও আহাদীসে লিপিবদ্ধ রয়েছে। .....কাজেই উম্মতের (সত্যিকার হাক্কানী) উলামা ও আওলিয়া যেহেতু পৃথিবীর চন্দ্র-সূর্যের তুল্য হয়ে থাকেন, তাদের দ্বারা পৃথিবীর অন্ধকার দূরীভূত হয়, সেহেতু আল্লাহ্‌তা'লা উক্ত গ্রহণদ্বয়ের মাধ্যমে আকাশের জ্যোতিষ্ক চন্দ্র ও সূর্যের অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়াকে উলামা ও ফুকারার অন্তর অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাওয়ার প্রতিকী চিহ্ন-স্বরূপ সাব্যস্ত করেছেন। অন্য কথায়, প্রথমে গ্রহণদ্বয় পৃথিবীস্থ চন্দ্র ও সূর্যে সংঘটিত হয় এইরূপে যে উলামা ও ফুকারার অন্তঃকরণ (ইমাম মাহ্‌দীকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করার কারণে) তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এ বিষয়ে সচেতন ক'রে দেয়ার উদ্দেশ্যেই আকাশে গ্রহণদ্বয় সংঘটিত হয়, যাতে প্রতিভাত হয়, যে বিপর্যয় উলামা ও ফুকারার অন্তঃকরণে অবতীর্ণ হয়ে তাদেরকে গ্রহণাচ্ছন্নতায় উপনীত করেছে। তারপর আকাশ উহার সাক্ষ্য প্রদান করেছে। কেননা, আকাশ পৃথিবীর কর্মাকর্মের সাক্ষ্য দিয়ে থাকে। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সময়ে 'শাক্কুল-কমর'—'চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত' হওয়ার মাঝেও এই হিকমতই নিহিত ছিল যে, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের জ্ঞানালোক প্রাপ্ত লোকেরা উহাতে কায়েম থাকতে পারে নি। তাদের সততা ও সাধুতা ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে পড়ে। কাজেই তখনও আকাশে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার নিদর্শন দ্বারা এ গুঢ়তত্ত্বই প্রকাশ পেয়ে ছিল যে, পৃথিবীতে যারা আলোকের উত্তরাধিকারী ছিল তারা (নবী করীম সাঃ-কে গ্রহণ না ক'রে) অন্ধকারকে ভালবেসেছে।

এ স্থলে সাম্প্রতিক কালের দুঃখজনক ব্যাপার এই যে, বহু দিন গত হলো, আকাশের গ্রহণদ্বয় রমযান মাসে সংঘটিত হয়েও গেলো এবং চন্দ্র ও সূর্য উভয়ই (গ্রহণমুক্ত হয়ে) পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হয়ে পড়লো, কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধবাদী উলামা ও পীর-ফকিরগণ, যারা 'শামসুল-উলামা' ও 'বদরুল-উরাফা' বলে কথিত হন, তারা আজও নিজেদের গ্রহণাচ্ছন্ন অবস্থাতেই আটক হয়ে আছেন।

রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ এই ইঙ্গিত বহন করে যে, রমযান পবিত্র কুরআন ও ঐশী কল্যাণাবলী অবতরণের মাস। প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্‌দীও রমযানের মতই বৈশিষ্ট্য-

সম্পন্ন। কেননা তাঁর যুগও রমযানের মতই পবিত্র-কুরআনের অফুরন্ত তত্ত্বজ্ঞান এবং বরকত ও আশিস প্রকাশের যুগ। কাজেই তাঁর এহেন যুগে আলেমদের পরাঙ্মুখ হয়ে তাঁকে কাফের বলা এমনই যেমন রমযানে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হওয়া।

যদি কেউ এরূপ স্বপ্ন দেখে যে, রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ হয়েছে, তা'হলে এর তা'বীর হয়ে থাকে এই যে, আলেমেরা কোনও বরকতমণ্ডিত ব্যক্তির সমসাময়িক বিরোধিতা করবে। গালিগালাজ, অপমান-অবমাননা ও অস্বীকার এবং কুফরী ফতওয়া দ্বারা তাঁর প্রতি অসদাচরণ প্রদর্শন করবে।

তেমনি প্রতিশ্রুত পুরুষকে 'মাহদী' ('হেদায়াত প্রাপ্ত') নামে এজন্য অভিহিত করা হয়েছে যে, উক্ত শ্রেণীর মানুষেরা তাঁকে মাহুদী তথা হেদায়াতপ্রাপ্ত বলে মনে করবে না বরং কাফের ও বেদীন বলে আখ্যায়িত করবে। কাজেই উক্ত নাম পূর্ব থেকেই তাঁর সত্যতার সপক্ষে প্রতিরোধ ও তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদ খণ্ডনস্বরূপ নির্দ্ধারণ করা হয়েছে। যেমন, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নাম তাঁর কুৎসা ও নিন্দাকারীদেরকে রদ করার উদ্দেশ্যে 'মুহাম্মাদ' ('অত্যন্ত প্রশংসিত') রাখা হয়েছিল, যাতে এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত থাকে যে, দুষ্কৃতকারী ও খবিস লোকেরা অতীব প্রশংসার যোগ্য এই নবীর নিন্দা ও কুৎসা করবে। অথচ তিনি হচ্ছেন 'মুহাম্মদ' অর্থাৎ অত্যন্ত প্রশংসিত। 'মুযাম্মাম (নিন্দিত) তিনি হতেই পারেন না।

এবারে ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, হাদীস শরীফে দুইবার চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের ওয়াদা ছিল। তদনুযায়ী প্রথমবার উলামা ও পীর-ফকিরগণ নিজ হাতে নিজেরাই উহা পূরা করলেন, কেননা তারা জ্ঞান ও মা'রেফাতের আলো লাভ করেও সেই প্রতিশ্রুত পুরুষ হতে স্বজ্ঞানে মুখ ফিরিয়ে নিলেন যাকে গ্রহণ করা তাদের উচিত ছিল। তবে তাদের পক্ষে অবশ্য তদ্রূপ করাই অবধারিত ছিল। কেননা ভবিষ্যদ্বাণী রূপে লিপিবদ্ধ ছিল যে, প্রথম দিকে প্রতিশ্রুত পুরুষ ইমাম মাহুদীকে কাফের বলে আখ্যাত করা হবে। সুতরাং তারা আমাকে কাফের বলে ঐ ভবিতব্যই পূরা করলেন। দ্বিতীয় বার গ্রহণদ্বয় আকাশে পূর্ণ হলো।"

(যমীমা আঞ্জামে আথম, রূহানী খাযায়েন, ১১ খণ্ড, পৃঃ ২৯৫, ২৯৬)

অনুবাদঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
সদর মুরব্বী

হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রহঃ) বলেনঃ

- স্মরণ রেখ, সত্যবাদিতা এমন একটি জিনিস যা মানুষের কার্যক্রম সম্বন্ধে বলে দেয়।
- আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যিকরে ইলাহীতে ভরপুর হওয়া উচিত।

জুমুআর খুতবা

[সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ) কর্তৃক ২৬-১১-৯৩ তারিখে মসজিদ ফযল লণ্ডনে প্রদত্ত জুমুআর খুতবার বঙ্গানুবাদ]

অনুবাদক : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ,
সদর মুরব্বী

তাশাহ্হুদ, তা'আওউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযুর (আইঃ) নিম্নরূপ আয়াতে কুরআনী তেলাওয়াত করেন :

وانا اخترتك فاستمع لما يوحى ○ انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلوة لذكري ○ ان الساعة اتية اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى ○ (طٰہٰ : ۱۴-۱۶)

'যিক্‌রে-ইলাহী'র বিষয়ে আমি বিগত খোতবার যেখানে শেষ করেছিলাম সেখান থেকে বিষয়বস্তুর ধারাবাহিক অবতারণা করবো। কিন্তু তার পূর্বে আজ যেমন নিত্য-নৈমত্তিক এক রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং ইহা একটা বাধ্যবাধকতাও বটে, কেননা বিশ্ব-ব্যাপী জামাতসমূহে যে সকল সভা-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাদের পক্ষ থেকে আকাঙ্খা পেশ করা হয়, তাদের 'যিকরে খায়ের'ও যেন এই মজলিসে চলে, (তাদের বিষয়েও যেন উল্লেখ করা হয়) যাতে তারা বিশ্বময় অন্যান্য সকলের দোয়া পেতে পারেন। অতএব, এই দৃষ্টিকোণ থেকে যদি অল্প একটু সময় প্রত্যেক জুমুআয় তাদের উল্লেখ প্রসঙ্গে ব্যয়ও হয়ে যায় তাতে আপত্তির কিছু নেই। তাদের ঐ সব সভা-সম্মেলনকে, যেগুলোর তালিকা আমি পাঠ ক'রে শুনাব এবং কিছুটা বিবরণও রাখব, আল্লাহ্‌তা'লা যেন তাঁর ফযল ও করমে তাঁর যিক্‌র প্রতিষ্ঠার কারণ ও আকরে পরিণত করেন। আজ বিশেষভাবে ঐ সভা-সম্মেলনগুলির জন্য দোয়া করা উচিত। যেন ঐগুলি আল্লাহ্‌র যিকিরের মজলিস হয়ে যায় এবং ভবিষ্যতেও যেন আমাদের সব সভা-সম্মেলনই সদা সর্বদা যিকরে-ইলাহীর জন্যে ঐকান্তিকভাবে নির্দিষ্ট হতে থাকে।

'যিকর' প্রসঙ্গে আমি বিশেষভাবে এই উপদেশ দিতে চাই এবং এটাই আমার খোতবারও বিষয়বস্তু হবে যে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যিক্‌র হচ্ছে ইবাদত প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ সেই নামাযের প্রতিষ্ঠা, যা কোরআন করীম বর্ণনা করেছে। যে নামাযকে হযরতে আকদাস মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) তাঁর পবিত্র সুন্নত ও সীরাতে (জীবনাদর্শে) জারি (ও কার্যকর) ক'রে দেখিয়ে গেছেন। সবচেয়ে উত্তম, শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট যিক্‌র উহাই বটে। যদি তা না হয় তাহ'লে বাকি সব যিক্‌রের কোনও মূল্যই থাকে না। কোনও গুরুত্বই থাকে না। অতএব, নামাযের উপর বিশেষ জোর দিন।

ইজতেমাসমূহের জন্যে দোয়া ঃ

ঐসব ইজতেমা যা আজ শুরু হবে অথবা আগামী কাল হবে, ওগুলি ছাড়াও বিগত খোতবায় যে তিনটি ইজতেমার উল্লেখ সম্ভব হয় নি প্রাইভেট সেক্রেটারী সাহেব সেগুলির কথা স্মরণ করিয়েছেন। যেহেতু তাদের পক্ষ থেকে অভিযোগ আসে সেহেতু যদিও সেগুলি পূর্বেই অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে তবুও আজ সেগুলোরও নাম বলে দেয়া বাঞ্ছনীয়। ঐ তিনটি সালানা ইজতেমা ছিল শুক্কুর, কসুর ও শাহীওয়াল জিলাসমূহের। এরপর হুযূর মুজাফ্ফারগড়, হেসবার্গ, শ্রীলঙ্কা ও মানচেষ্টারে অনুষ্ঠিতব্য সভা-সম্মেলন ও ইজতেমার উল্লেখ করে বলেন, তারাও খাহেশ প্রকাশ করেছেন, তাদেরকেও যেন দোয়ায় স্মরণ রাখা হয়।

নামাযের উপকারিতা ঃ

বিগত খুতবায় বর্ণনা করেছিলাম যে, খোদাতা'লা যেখানে বলেছেন : ولذكر الله اكبر 'আল্লাহ্‌র যিক্‌র সর্বাপেক্ষা বড়', সেখানে কোন কোন সূফী ও তফসীরকারক ইহার এই অর্থও গ্রহণ করেছেন যে, নামাযের মোকাবেলায় আল্লাহ্‌র যিক্‌র, যা কিনা সমগ্র মানবজীবনে ছড়িয়ে আছে—ইহা নামায অপেক্ষাও বড়। অথচ এই অর্থ সঠিক নয়। উক্ত আয়াতটি আমি পুনরায় আপনাদের সামনে পাঠপূর্বক উপস্থাপন করছি। এর 'তরতীব' (—বর্ণনার ক্রমিক-ধারা) থেকে আপনারা নিজেরা বুঝে যাবেন অথবা বুঝা উচিত যে, এখানে নামাযের মাধ্যমে যিক্‌র-এর বিষয়েই ধারাবাহিক উল্লেখ চলছে। নামাযের বাইরের যিকর সম্বন্ধে নয়। আল্লাহ্‌তা'লা বলেন :

اتل ما اوحى اليك من الكتاب واقم الصلوة (٢٩ : ٤٦)

—'তোমার উপর যা ওহী করা হচ্ছে সে কিতাব পাঠ কর এবং নামায কায়েম কর।' এই কিতাবের মধ্যে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো নামায প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত বিষয়বস্তু।

ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر - ولذكر الله اكبر -

—'নামাযের উপকারিতার মধ্যে দু'টি উপকার হলো, নামায 'ফাহ্‌শা' (বেহায়াপনা) এবং 'মুনকার' (অশোভনীয় কাজ) হ'তে বাধা দেয়।' এখানে উল্লেখিত দু'টি বিষয়ই হচ্ছে না-সূচক। যদি এখানেই কথা শেষ বলে ধরা হয় এবং এর পরেই নামায ব্যতীত অন্য কোন কিছুর উল্লেখ শুরু হয়ে যায়, তাহ'লে প্রতীয়মান হবে যেন নামাযের উদ্দেশ্য কেবল কয়েকটি জিনিস হ'তে বাধা দেওয়াই মাত্র। উপকার করে এমন ইতিবাচক জিনিসও প্রদান করা যেন নামাযের উদ্দেশ্য নয়।

এরূপ ভুল ধারণার সৃষ্টি হওয়াই উচিত নয়। কেননা কুরআন করীমের বর্ণনার ক্রমিক-ধারা হল এই যে, নামায 'ফাহ্‌শা' থেকে বাধা দেয়। 'মুনকার' থেকে বাধা দেয়।

"ওলা-যিক্‌রুল্লাহে আকবার" —এবং নামাযের সব চেয়ে বড় ফায়েদা হচ্ছে, ইহা তোমাদেরকে 'যিক্‌র' প্রদান করে। অবশ্যই যিকর ঐ সব বিষয়ের চাইতেও বড়।' আয়াতটিতে এরূপ তরতীব বিদ্যমান, যা আমার পূর্ব বর্ণিত বিষয়ের সাথেই সম্পৃক্ত ও সঙ্গতিপূর্ণ। অর্থাৎ প্রথমে 'তাবাত্‌তুল ইলাল্লাহ্‌' (অন্য সব কিছুর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকে পড়া) আবশ্যকীয় হয়ে থাকে। তার পরেই কিনা যিক্‌র চলে। 'ফাহ্‌শা'-এর সঙ্গে যদি সম্পর্ক জড়ান থাকে এবং অপসন্দনীয় বিষয়গুলি অন্তরে জমাট বেঁধে থাকে, তাহলে যিকরে-ইলাহীর প্রশ্নই উঠে না। অতএব, আল্লাহ্‌ বলেছেন, নামায প্রথমে তোমাদেরকে পাক-সাফ করে ; তোমাদের অভ্যন্তরীণ ময়লা ধুয়ে পরিষ্কার করে। যেমন কালাইকর বা এনামেলকারীকে যখন তৈজষপত্র দেয়া হয়, সে তখন প্রথমে এসিড দিয়ে সেগুলির ময়লা ছাড়ায়। তারপর যখন সেগুলি কালাই গ্রহণ করার মত উপযুক্ত হয়ে যায়, তখন ওগুলির উপর কালাই-এর প্রলেপ দেয়া হয়। ইহা কুরআন করীমের বাচনভঙ্গী। এ থেকে এই অর্থ গ্রহণ করা যে, নামাযের যিক্‌রকে বাদ দিয়ে যেন নামায বহির্ভূত যিক্‌রের কথা শুরু হয়ে গেছে। "ওলা যিক্‌রুল্লাহে আকবার" বলে যেন বলা হচ্ছে যে, নামায তো খারাপ বিষয় থেকে বিরত রাখবে, কিন্তু নামায শেষ করে যখন যিক্‌র করবে তখন উহাই হবে সবচে' বড় ব্যাপার। এরূপ অর্থ বর্ণনা-ধারার পরিপন্থী।

খোৎবার প্রারম্ভে কুরআন করীমের যে আয়াতসমূহ পাঠ করেছি সেগুলিতেও এই একই বিষয়বস্তু রয়েছে যে, যিক্‌রের সম্পর্ক নামাযের সাথে বিজড়িত। لا إله إلا أنا —আমি ব্যতীত কোন খোদা বা মা'বূদ নেই। অতএব, 'ফা'বুদনী'—আমার ইবাদত কর। "ওয়া আকিমিস সালাতা লেযিক্‌রী"—এবং নামাযকে আমার যিক্‌রের জন্যে কায়েম কর।

অতএব, ইবাদতের তো উদ্দেশ্যই যিক্‌র প্রতিষ্ঠা। যদি না ইহাতে যিকর থাকে, তাহলে ইবাদত কেবল এক খালি কলস বা অন্তঃসার শূন্য পাত্র বই কিছুই নয়। কাজেই "ওলা-যিকরুল্লাহে আকবার" নামায প্রতিষ্ঠার সাথে সম্পৃক্ত। কেবল নামাযই নয় বরং অন্যান্য সব ইবাদতের সাথেও। কিন্তু যিক্‌রে-ইলাহীর সৌভাগ্য নামাযে তখনই লাভ হবে যখন প্রথমে নিজের অন্তরকে 'ফাহ্‌শা' এবং 'মুনকার' হতে পাক-পবিত্র করা হবে। এ সেই বিষয়, যার গুরুত্ব অত্যধিক। খুব ভালভাবে ইহা বুঝে নেয়ার পরই (সত্যিকার) নামায কায়েম করা উচিত।

যিক্‌রে ইলাহী কীরূপে কায়েম হতে পারে ?

এখন আপনারা লক্ষ্য করে দেখুন, যদি নামায পড়ার সময় কারও অন্তরের সম্পর্ক বেহুদা বিষয়াদির সঙ্গে জড়ান থাকে—যেমন, কোথাও কোন কিছু থেকে নিজেকে কোন রকমে ছাড়িয়ে কেহ নামাযে এসে থাকে কিন্তু তার মন সেখানেই আটকে থাকে, তাহলে ইবাদতে কী ক'রে যিক্‌রে-ইলাহী প্রতিষ্ঠিত হতে পারে ? মুখে কয়েকটি বাক্য উচ্চারণ করার পরই

তার চিন্তা সে জিনিসের দিকে চলে যাবে যেখানে তার মন আটকে আছে। কখনও প্রিয়দের কথা স্মরণ হবে। কখনও ব্যবসায়-বাণিজ্যের সমস্যাদি তার চিন্তাকে আচ্ছন্ন করবে। কখনও টেলিভিশনের প্রোগ্রাম তাকে উহার দিকে আসক্ত ও উৎসুক করে তুলবে। আবার কখনও খেলা-ধূলা অথবা অন্যান্য চিত্তাকর্ষক ব্যাপারাদি—বিনোদন, ভ্রমণ ইত্যাদি তার মনোযোগ নিজের দিকে টেনে নিবে। এমতাবস্থায় এ বেচারীর কি করে যিকরে-ইলাহীর সুযোগ লাভ হবে?

যিক্‌রে-ইলাহীর বিষয়বস্তু তো হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক অবস্থায় মানুষের মন-মস্তিষ্ক সে অবস্থা থেকে লম্ফ দিয়ে আল্লাহ্‌র যিক্‌র বা স্মরণে রত হয়ে পড়ে। কুরআন করীম যিকরের বিষয় এরূপই বর্ণনা করেছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন:

الذين يذكرون الله قياما و قعودا و على جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والارض - (١٩٢ : ٣)

—তারা পৃথিবী ও আকাশমালার দিকে তাকায়। ভ্রমণ করতে গিয়ে এগুলি দেখে বিচিত্র সৌন্দর্য উপভোগ করে থাকে, কিন্তু এইভাবে যে, এসব দেখে তাদের অন্তর খোদার দিকে ধাবিত হয়। স্পন্দিত হয়। প্রত্যেক বস্তুতে বা বিষয়েই খোদার কথা তাদের স্মরণ হতে থাকে। তারপর কুরআন নিদ্রাযাপনকারীদের চিত্র তুলে ধরেছে এইরূপ:

تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا و طمعا - (٣٢ : ١٧)

—তাদের প্রতিপালক প্রভূকে তারা আহ্বান করতে থাকে, ভীতির সহিত এবং আশা-প্রত্যাশার সাথেও।

কাজেই 'যিকরে-ইলাহী' সমগ্র মানবজীবনে অবশ্যই পরিব্যপ্ত। তবে এর মানে এই যে, প্রত্যেক কাজ ও কর্ম-ব্যস্ততা এবং কৌতুহলই যেন আল্লাহ্‌র দিকে মানুষের মনোযোগকে ফিরিয়ে দেয় এবং অন্তর যেন এইরূপ উদ্ববেলিত-উচ্ছলিত হয় যেরূপ দুগ্ধ পোষ্য শিশু মায়ের বুকের দিকে উদগ্রীব হয়ে উঠে। তবে এর এই অর্থ নয় যে এখানেই যিকর নিঃশেষ হয়ে যাবে। এই যিক্‌রকেই যথেষ্ট বলে মনে করা হবে। বরং এ সবকিছুই নামাযের উদ্দেশ্যেই প্রস্তুতি স্বরূপ। যদি এই পরিমণ্ডল রচিত ও স্থাপিত হয় তাহ'লেই নামাযে যিকর প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। অন্যথায়, পারবে না। নামাযে তখন এমনই মনে হবে যেন সাময়িক-ভাবে আমরা দুনিয়ার এইসব সম্ভোগ হতে ছুটি নিয়ে এসেছি। এদিকে সালাম ফিরানো মাত্র ওদিকে আল্লাহ্‌কেও সালাম। ফিরে এসে দুনিয়াতে আবার নিমগ্ন। কিন্তু খোদাতা'লা যে জগতের চিত্র পেশ করেছেন সেখানে দুনিয়ার প্রত্যেক কাজ-কর্মই তাকে খোদার দিকে নিক্ষেপ করতে থাকে। আল্লাহ্‌র দিকেই আকৃষ্ট করতে থাকে। তাঁর দিকেই সে উন্মুখ ও স্থানান্তরিত হতে থাকে।

যিক্‌র-এর অর্থ ঃ

যিক্‌রে-ইলাহী সম্পর্কে বিভিন্ন সূফীগণ যা বুঝেছেন বা বলেছেন অথবা তদনুযায়ী শিক্ষা দিয়েছেন সংক্ষেপে উহার উল্লেখ করার পর আমি হযরতে আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সূত্র ধরে কুরআন করীমে বর্ণিত যিক্‌রের সংজ্ঞা নির্ণয় করবো এবং আপনাদেরকে বোঝাবো, প্রকৃত যিক্‌র কী? কিন্তু তার আগে অভিধানবেত্তাগণ কুরআন করীমের বিভিন্ন আয়াত দেখে যিক্‌র এর যে সকল অর্থ বর্ণনা করেছেন সেগুলি আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি :

যিক্‌র-এর অর্থ সুখ্যাতি, নামায, দোয়া, কুরআন তেলওয়াত, তসবীহ, শোক্‌র, ইতায়াত বা আনুগত্য, আল্লাহ্‌র হাম্‌দ ও প্রশংসা, সম্মান-মর্যাদা। যেমন, কুরআন করীম বলে :

وانه لذكرلك ولقومك (৪৩ : ৪৫)

—দেখ, এ বিষয় তোমার ও তোমার জাতির জন্যে সম্মান ও মর্যাদা ইত্যাদির কারণ।

এগুলি হলো স্থান-কাল-পাত্র ভেদে যিক্‌র এর শাব্দিক অর্থ। কিন্তু ইহাতে বিষয়টি পুরাপুরি বোধগম্য হতে পারে না। কেবল শব্দগত অনুবাদ বা অর্থ শুনে তো বিষয়বস্তুর কিছুই আপনাদের পক্ষে বুঝে নেয়া সম্ভব নয়।

এখন আমি আপনাদের সামনে পূর্ববর্তী সূফীগণ এবং অন্যান্য বুজর্গানে-উম্মতের সূত্রে যিক্‌র-এর সেই বিষয়বস্তু পেশ করছি, যা তারা বুঝেছেন ও অনুশীলন করেছেন এবং উহা অনুশীলন বা আমল করার জন্যে মানুষকে আহবান করেছেন। কিন্তু তার আগেই আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দিতে চাই যে যিক্‌রকারী এরূপ বহু ফির্কার সৃষ্টি হয়েছে, যারা যিক্‌র-এর মর্ম পুরাপুরি বুঝতে পারেন নি। অথবা সূচনাকালে ঐকান্তিকভাবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যই যিক্‌র-এর সিলসিলা জারি করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালের লোকেরা আসল বিষয়ে গাফিল হয়ে যায় এবং নানা প্রথা ও রীতির অনুগামী হয়ে পড়ে। তারা যিক্‌র-এর চেহারাকেই বিকৃত করে ফেলে। এই সমুদয় ফির্কাগুলির উপর "ওলা-যিকরুল্লাহে আকবার"—আয়াতের (বিকৃত অর্থের) প্রভাব বলে প্রতীয়মান হয়। আয়াতটিতে যে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ্‌র যিক্‌র সবচেয়ে বড়'—এর দ্বারা কতিপয় সূফী ধরে নিয়েছেন যে, নামায তুলনামূলকভাবে নিতান্ত মামুলী জিনিস। যদি যিক্‌র-এর মধ্যে মশগুল থাকা যায়, তাহ'লে আর নামাযের প্রয়োজন থাকে না। সুতরাং জুলুমের এক শেষ যে, এরকম ফির্কাসমূহও আবিষ্কৃত হয়েছে, যারা উম্মতকে নামায থেকে তৌবা করতে জোর তাগিদ দিয়েছে। তারা বলেছে, 'রাতদিন যিকিরের মধ্যে মশগুল থাক। নামাযের কোনও প্রয়োজন নেই!' অর্থাৎ হযরতে আকদাস মুহাম্মদ (সাঃ)-এর চেয়েও উন্নতমানের যিক্‌র আবিষ্কার করার চেষ্টা করা হয়েছে। সুবিদিত এক প্রবাদ বাক্যই তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য : 'মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশী'। (উর্দু ভাষায় : "মাঁ সে যিয়াদাহ্‌ চাহে, কাপ্‌পে কুট্‌নী কাহ্‌লায়ে"।)

আঁ-হযরত (সাঃ)-এর কাছ থেকে যিক্‌র শিখুন ঃ

'যিক্‌র' কেবল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) থেকেই শিখতে হবে। কেননা আল্লাহ তাঁকে মূর্তিমান 'যিক্‌র' বলে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ তিনি এমন এক সত্তা, যার সাথে যিক্‌র-এর কোনও পার্থক্য থেকে যায় নি। একই বস্তুর দু'টি নাম পড়ে গেছে। যেমন, লোহা যখন চুম্বক হয়ে যায়, তখন উহাকে লোহাও বলা যায়। আবার চুম্বকও। লোহা যখন আগুনে পড়ে থেকে লাল হয়ে যায় এবং আগুনের তাপকে আত্মস্থ করে নেয়, তখন আগুন ও লোহার মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকে না। কুরআন করীম থেকে জানা যায় যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) ছিলেন মূর্তিমান যিক্‌রে-ইলাহী। কাজেই যিক্‌র শিখতে হলে তাঁর কাছে শিখুন। তিনি নামায প্রতিষ্ঠায় এতো জোর দিয়েছেন যে, হাদীসাবলীর মাধ্যমে জানা যায়, হযরতে আকদাস মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অন্তর সর্বদা নামাযের মাঝে আটক হয়ে থাকতো। দুই নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে তাঁর অন্তরে সর্বক্ষণ এই আকাঙ্খা উকি-ঝুঁকি দিত, পুনরায় যেন তিনি মসজিদে যান। এমনিতর অবস্থার মধ্য দিয়ে প্রত্যেক রাতেও ঘুম থেকে উঠে নামায পড়তেন। কোন কোন সময় বহু রাত এভাবেই জেগে কাটিয়েছেন। অবশেষে আল্লাহ্‌তা'লা আদেশ বলে তাঁকে বাধা দিয়েছেন এই বলে যে, "এতো ইবাদত করো না। কিছুটা কমাও। পরিবর্তিত সময়ের দিক দিয়ে (রাত-দিনের হ্রাস-বৃদ্ধির অনুপাতে) কখনও কিছুটা (ইবাদতের সময়) বাড়িয়ে নিও। কিন্তু আরাম করার জন্যেও সময় রেখো।"

কাজেই হযরতে আকদাস মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর সুন্নতকে বাদ দিয়ে, উহার সূত্র না ধরে যখনই কুরআন করীমে দৃষ্টিপাত বা চিন্তা-ভবনা করা হয়, তখনই উহাতে ধোকা লাগার সম্ভাবনা থাকে, যা কোনও সময় স্পষ্ট, আবার কোনও সময় সুনিশ্চিত বলেই সাব্যস্ত হয়। কাজেই আমি যে সব উদাহরণ দিব, উহার অর্থ এ নয় যে কুরআন করীম ঐ সব যিক্‌র উপস্থাপন করেছিল। বস্তুতঃ কুরআন করীম ঐ সব যিক্‌রই পেশ করেছে যা আমরা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর সুন্নাতের মাঝে পেয়ে থাকি। সেগুলি ব্যতীত যিক্‌র-এর কোনও মূল্য বা ভিত্তি নেই। কিন্তু কতিপয় বুজর্গ এমনও ছিলেন, যারা সময়ের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য ক'রে কোনও সময় যিক্‌রকে সাধারণ লোকদের জন্যে সহজ করার উদ্দেশ্যে কিছু কিছু 'তরকীব' (কৌশলগত পদ্ধতি) উদ্ভাবন করেছেন (সেগুলি তাঁদের নিজস্ব চিন্তার ফসল মাত্র)। আমি মনে করি, তাঁদের উপর কোন দোষ বা আপত্তি আসে না। তাঁরা নিজেরা বুজুর্গ ছিলেন, পুন্যবান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। যদি চিন্তা করতে বা বুঝতে তাঁদের ভুল হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ্‌তা'লা তাঁদের সাথে মাগফিরাতপূর্ণ ব্যবহার করুন। কিন্তু তাঁদের চিন্তায় বা দৃষ্টিতে হয়তো এইরূপ নও-মুসলিমরা ছিল, যাদের পক্ষে ইবাদত সহজ ছিল না। তাই সূচনাকালে তাঁরা (বুজুর্গরা) ইবাদত

হ'তে অবশ্যই বারণ করেন নি। আমি কখনও বিশ্বাস করতে পারি না যে এই সকল সিলসিলার যাঁরা প্রবর্তক ও প্রতিষ্ঠাতা, তাঁরা ইবাদতের মোকাবেলায় (বা পরিবর্তে) যিক্‌র পেশ করেছিলেন। বরং ইবাদতের স্বাদ লাগাবার উদ্দেশ্যে, ইবাদতের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে তারা যিক্‌র-এর এরূপ কোন কোন আকার ও পদ্ধতি পেশ করেছেন, যার দ্বারা সাধারণ মানুষেরা যেন প্রথমে যিকরে উৎসুক হয়ে উঠে এবং এর ফলে পরবর্তীতে ইবাদতের স্বাদও পেতে আরম্ভ করে। কিন্তু পরবর্তী লোকেরা ঐ সব বিষয়কে বিকৃত করে ফেলে। এখন আমি ঐ সিলসিলাগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করবো।

সিলসিলা চিশ্‌তিয়া ঃ

চিশতিয়া একটি বিখ্যাত সিলসিলা। তাদের ওখানে কলেমা তৈয়ব পাঠ কালে "ইল্লাল্লাহ্'-এর উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়। ইহাকে তারা 'আঘাত হানা' বলে অভিহিত করে থাকেন। যেমন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-ইল্লাল্লাহ্—এইরূপে আঘাত হানতে হানতে তারা মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় এতো অভিভূত হয়ে পড়েন যে, তাদের কাছে এমনই মনে হয় যেন প্রতিটি আঘাত তাদের হৃৎপিণ্ডে পড়ছে। সমস্ত অস্তিত্ব তখন কাঁপতে আরম্ভ করে। যখন তাদেরকে ঐরূপ করতে দেখা যায় তখন সত্যিই মনে হয় যেন তারা যিক্‌র-এর দ্বারা পুরাপুরি আবিষ্ট হয়ে পড়েছেন। কিন্তু এহেন আঘাতের সন্ধান আপনারা হযরতে আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পবিত্র সত্তায় কখনও খুঁজে পাবেন না। সাহেবদের মধ্যেও না। কাজেই দর্শকদের প্রভাবান্বিত করার যে দৃশ্য তা হচ্ছে কেবল বাহ্যিক চোখের দৃশ্য মাত্র। বিকৃতির যুগে সরলমনা লোকেরা এই সব বিষয়ের দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হয়। তারা বলে, "দেখ, এই তো হচ্ছে যিক্‌র! যিক্‌র করতে করতে কত ব্যকুল হয়ে উঠেছে! দেখ, তার শরীর কেঁপে উঠেছে।" কিন্তু যদি উক্ত যিক্‌র ব্যতীত একই পদ্ধতিতে অন্য বাক্য উচ্চারণ ক'রে 'হৃদয়ের উপর আঘাত হানার' জন্যে তাকে বলা হয়, তাহ'লে উহার দ্বারাও কি তার কাছে অনুরূপ ফল পরিলক্ষিত হতে পারে? সত্য ঘটনা এই যে, ইহা কেবল একটা মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া মাত্র। সত্যিকার যিক্‌র-এর সন্ধান পাওয়া গেলে তা কেবল হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দরবার থেকেই পাওয়া যাবে। সেখানেও দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কম্পন হতে আরম্ভ করে এবং মানব-দেহের সমগ্র ত্বক শিহরিত হয়ে উঠে। হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মুখে উচ্চারিত যে যিক্‌র আপনারা শ্রবণ করবেন এবং সে অবস্থায় আঁ-হুযুর (সাঃ) ও তাঁর সাহাবাদের যে মনোভাবের উদয় হতো, সেই যিক্‌র ও মনোভাবও মানবাত্মায় শিহরণের সৃষ্টি করে থাকে।

এখন এই সমস্ত লোকেরা সাধারণতঃ যিক্‌র স্বরূপ বাক্যগুলির পুনরাবৃত্তি ক'রে নিজেদের মাথা এবং দেহের উর্ধাংশকে নাচাতে থাকে। এসব লোকের মধ্যে বিপুল সংখ্যায় শিয়ারা রয়েছেন। তাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সামা' (سماع) প্রথা। তারা বলেন, সামা'

অর্থাৎ গানের আকারে এবং সঙ্গীতের সুরে যদি যিক্‌র শ্রবন করা হয়, তাহ'লে এক আত্মবিভোর অবস্থার অবতারনা হয়। অনেক সময় ঐ অবস্থায় এই সকল লোক ক্লান্ত-ও বে-হাল হয়ে পড়েন। সাধারনত: এই লোকগুলো রঙ্গীণ কাপড় পরিধান করে থাকেন। বেশীর ভাগ গেরুয়া রংকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

তাদের আগে আবার অনেকগুলো সিলসিলা আছে। একটি হচ্ছে 'চিশতিয়া নিযামীয়া'। এইটি হিন্দুস্থানে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছে। দিল্লীতে হযরত খাজা হাসান নিযামীর যে সিলসিলাটি আছে উহা এই চিশতিয়া নিযামীয়ার সাথেই সম্পৃক্ত। খাজা হাসান নিযামীর ভাষায় শ্রবণ করুন। তিনি লিখেছেন "প্রথমে বার (১২) দিন নিভৃতে বসা উচিত।" অর্থাৎ তিনি যিক্‌র-এর কী পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন? বলছেন: "প্রথমে বার দিন বসা উচিত।" কুরআন ও হাদীসের কোথায় এই বার দিনের নিভৃতবাস পরিলক্ষিত হয়?! আমরা তো জানি যে প্রত্যেক বছর একটি মাসে দশ দিনের জন্যে মসজিদে ই'তেকাফে বসা উচিত। এ সেই যিক্‌র-এর পদ্ধতি, যা আমরা হযরতে আকদাস মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা:)-এর কাছ থেকে শিখেছি এবং যার উল্লেখ কুরআন করীমে রয়েছে। ইহা কুরআন ভিত্তিক যিক্‌র। কিন্তু এখন নতুন নতুন আবিষ্কারসমূহ শ্রবণ করুন। খাজা সাহেব বলেন: "প্রথম বার দিন নিভৃতে বসা উচিত। প্রত্যেক দিন ত্রিশ বার 'দোয়া-এ-হিযবুল বাহর' পাঠ করা উচিত। শুরু করার পূর্বে একটি বৃত্ত আঁকা হোক। উহাতে এরূপ প্রবেশ-পথ রাখুন, যাতে প্রবেশ কালে 'আমিলে'র মুখ কিবলার দিকে থাকে।" এখন পরিষ্কার জানা যাচ্ছে, হিন্দুস্থানে মন্ত্র-তন্ত্রের যে সব প্রথা-পদ্ধতি চালু ছিল, যে সব যাদুবিদ্যার পদ্ধতি চালু ছিল সেগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই সূফী সাহেবান এই ধরনের বেহুদা জিনিস আবিষ্কার ক'রে নিলেন। না পবিত্র কুরআনের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক, না সুন্নতের সাথে কোনও সংশ্রব, না জ্ঞান-বুদ্ধি এগুলোকে স্বীকার করে নিতে পারে। তিনি আরও বলেছেন, "যখন প্রবেশ করে যাও, তখন রেখা টেনে প্রবেশপথ বন্ধ করে দাও।" এর মানে, এখন আর শয়তান সেখানে ঢুকতে পারবে না! তিনি আরও বলেন: "যখন 'আমল' পাঠ শেষ কর, তখন ষ্টীলের ছুরি অথবা চাকু দিয়ে বৃত্তের মুখ কেটে নিজের বেরুবার পথ বানাও। অর্থাৎ যিকর-ফিক্‌র সমাপ্ত করার পর যে রেখা টেনেছ, ওটা চাকু দ্বারা (তবে ষ্টীলের ছুরি শ্রেয়) কাটা হোক এবং বেরুবার রাস্তা বানানো হোক। অন্যথায়, রেশমী ডোরা দিয়ে বৃত্ত তৈরী করে নেয়া হোক। বৃত্ত বানাবার সময় আয়াতুল-কুরসী পাঠ করা হোক। 'আমল' পালন কালে যবের রুটি (খাদ্য তালিকায়) হওয়া উচিত। 'সাহেবুল-হিয্‌ব' (দোয়া-হিয্‌বুল-বাহর'-এর আবিষ্কারক) হযরত আবুল হাসানের আত্মার কাছ থেকে প্রথমে আপন ধ্যানে অনুমতি গ্রহণ করে নেওয়া উচিত এই বলে, হে আবুল হাসান! আমি আল্লাহ্‌র যিক্‌র করতে ইচ্ছুক। অনুমতি আছে তো! যদি অনুমতি হয়ে যায় তবে তো ভালই। নচেৎ প্রত্যুত্তরে বলবে কে? ব্যাঘাৎ ঘটার কিছুই নেই। কেবল এটুকু বলাই যথেষ্ট, অনুমতি দিয়ে দাও। অবলীলায় অনুমতি পাওয়া গেল।" (কিতাব আ'মাল

হিয্‌বুল-বাহ্‌র, শাম্‌সুল-উলামা খোওয়াজা হাসান নিযামী দেহলভী প্রণীত, নবম সংস্করণ, জুলাই ১৯৪০ইং, দিল্লী)।

যিক্‌র-ইলাহীর নক্‌শবন্দী তরিকা ঃ

যিকরে-ইলাহীর একটি পদ্ধতি নক্‌শবন্দীয়া তরীকারও আছে। আমি যদ্দুর খোঁজ-খবর নিয়ে খতিয়ে দেখেছি তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নক্‌শবন্দীয়া নিশ্চয় সূচনাকালে সবচেয়ে উত্তম ছিল। সুন্নত-বিচ্যুত ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে "শায়খের কল্পনা" প্রবিষ্ট হয়ে সঠিক পথ হতে তাদের কিছুটা বিচ্যুতি ঘটিয়েছে। তারা 'যিক্‌রে-জলী' (উচ্চৈস্বরে যিকিরের) খিলাফ। যেসব আওয়াজ বের করা হয়, নড়া-চড়া ও অঙ্গ-ভঙ্গী করা হয়—তারা এসবের বিরোধী। 'যিক্‌রে-খফী' (নীরবে যিক্‌র)-কে তারা জায়েয মনে করেন। 'মুরাকাবা'র সময় মাথা নত ক'রে, মাটির দিকে দৃষ্টি রেখে খোদাতা'লার ধ্যানে মগ্ন হবার এক পদ্ধতি তাদের মাঝে চালু রয়েছে। তারা সঙ্গীত ও সামা' বা সঙ্গীত শ্রবণের শক্ত বিরোধী। তাঁরা মনে করেন, এগুলি সুন্নত বিবর্জিত বিষয়। এগুলি কুপ্রভাব বিস্তার করতে পারে। তারা শরীয়তের হুকুম-আহ্‌কাম কঠোরভাবে পালন করে থাকেন। তাদের ওখানে মুর্শেদ নিজের মুরিদান থেকে পৃথক বসেন না, বরং হাল্‌কা—অর্থাৎ যিকিরের মজলিসে তাদের সহিত শরীক হয়ে বসেন এবং "তওয়াজ্জো ইলাল-বাতিন"-এর মাধ্যমে তাদের পথ প্রদর্শন করে থাকেন। সূচনাকালে এটাই তাদের তরিকা বা পদ্ধতি ছিল। এই নক্‌শবন্দীয়া ফির্কাটিই রাশিয়াতে অত্যন্ত বরণ্য হয় ও বিস্তার লাভ করে। রাশিয়ায় বিগত একশ' বছরের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, সেখানে ইসলামকে সঞ্জীবিত ও কায়েম রাখার ক্ষেত্রে সবচে' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে এই নক্‌শবন্দীয়া ফির্কাটি। এই ফির্কার যে সব শাখা রাশিয়ায় ছিল সেগুলিতে কমপক্ষে ঐ ধরণের সূফী ছিলেন না, যাঁরা 'আমল' বা কর্ম বিমুখ হয়ে মসজিদে বা নিভৃত ফোকর ও কুটিরে আবদ্ধ হয়ে আত্মমগ্ন অবস্থায় পড়ে থাকেন। এঁরা কর্ম-জীবনে অংশ গ্রহন করতো। আমলী জিহাদে বিশ্বাসী ছিল। যারের সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অথবা পরবর্তীকালে কম্যুনিষ্ট সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধেও ইসলামের পক্ষ থেকে যখনই কোনও কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে তখন বেশীর ভাগ এই নক্‌শবন্দী ফির্কার নেতৃত্বে ও দিক-নির্দেশনায়ই হয়েছে। রাশিয়ার যার সবচে' বেশী তাদেরকে ভয় করতো। অতএব, নক্‌শবন্দী ফির্ক সম্পর্কিত এই বিশেষ দিকটি দৃষ্টি গোচর রাখা উচিত যে, ইহা গভীর চিন্তা-ভাবনা ও মনোনিবেশে এবং নিজের অন্তরে নিমগ্ন হয়ে আল্লাহ্‌তা'লার গুণাবলীকে নিজের অন্তঃকরণে এবং শিরা-উপশিরায় অঙ্কন (নাক্‌শ) করার নামান্তর। এ পর্যন্ত তো তাদের মধ্যে কোনও খারাপি নেই। কিন্তু আফসোস এই যে পরবর্তীকালে যে 'শায়খ' তাদের মাঝে উপবিষ্ট হতেন তার দিকে যখন এই ক্ষমতারোপ করা হলো যে, তিনি তার চিন্তা ও মনন এবং তার অভ্যন্তরীণ শক্তির দ্বারা অন্যান্যদের অন্তরে 'অঙ্কন' (নাক্‌শ) সঞ্চারিত করেন, তখন ইহার দ্বারা বেদাত শুরু হয়ে যায়। আর তারপর অবস্থা এই দাঁড়ায় যে আল্লাহ্‌র কল্পনা ও মননের পরিবর্তে 'শায়খে'র কল্পনা ও মনন তাদের অন্তরে আসন গেড়ে বসলো। এবং এই ফির্কার মধ্যে এই হেদায়াত বা শিক্ষা জারী করা হলো যে, তোমরা যখন (যিক্‌র-এর মজলিসে) বসবে, তখন খোদার পরিবর্তে শায়খকে কল্পনা করবে। এবং শায়খের সাহায্য করবে কেননা সে খোদার কল্পনা তোমাদের মধ্যে প্রবেশ করাবার চেষ্টা করছে। এমনি ধারায় এই ফির্কাটিও, যার সূচনা হয়েছিল ঐকান্তিকভাবে শরীয়তের উপরে ও নেক নিয়্যতের উপরে, ধীরে ধীরে বিকারগ্রস্থ হয়ে বেদাতের এক আকরে পরিণত হয়। (ক্রমশঃ)

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মতামত ঃ

ধর্মরাষ্ট্র গঠনের কল্পবিলাস
কাদিয়ানী সমস্যার অভিজ্ঞতা

ইমতিয়ার শামীম

'আমি শান্তি বিলাইতে আসি নাই, আসিয়াছি তরবারী দিতে' —বাইবেল

ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় কিছু দিন হলো জামাতে ইসলামী একটি দাবী নিয়ে তৎপর হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন জায়গায় আয়োজিত আলোচনা সভায় কিংবা দেয়াল লিখনে উত্থাপিত ঘোষণার মর্ম এ রকম ঃ 'কাদিয়ানীরা ইসলামের শত্রু', 'কাদিয়ানীদের রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণা করতে হবে,' 'কাদিয়ানীদের কতল কর' ইত্যাদি। রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের এই দেশে এসব বিশেষ দাবি উত্থাপনকারীরা প্রথমে নিজেদের পরিচয় বিবৃত করেছিল 'তৌহিদ জনতা' নামে। এখন তারা নিজেদের মুখোশ ও খোলস খুলে উন্মোচন করেছে, ফলে ভেতরে দেখা যাচ্ছে 'জামাতে ইসলামী' নামক শরীর।

২. বলার অবকাশ রাখে না, সংখ্যালঘু ধর্মভিত্তিক জনগোষ্ঠীকে ঘিরে সারাদেশে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টিতে ব্যর্থ হওয়ায় এবং তার অবকাশও কমে আসায়, ভারত নিয়ে রাজনীতির শিল্পকলাটিও চোরাচালান বিরোধী অভিযানের অকার্যকারিতায় অন্তঃসারশূন্য প্রমাণিত হওয়ায় এবং সবশেষে দ্বিপাক্ষিক সমস্যাভিত্তিক আলোচনা ফলপ্রসূ না হওয়ায় অর্থাৎ সরকারি উদ্যোগে সাম্প্রদায়িক অবস্থা বজায় রাখার ব্যর্থতার বিকল্প পথ হিসেবে এখন অপপ্রয়াস চালানো হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মাবলম্বীদের ভেতরেই সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করার। ইদানিং সুন্না অধিকার বাস্তবায়নেরও দাবী উঠেছে। এ দাবিকে অনেক পর্যবেক্ষকই দেখছেন উপযুক্ত প্রবণতার প্রতিক্রিয়া হিসেবে। কারা এই সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির অনাকাঙ্খিত কাজে সম্পৃক্ত তা আরো পরিষ্কার হয় যদি পেছনের দিকে তাকাই।

৩. সর্বজ্ঞাত যে, পাকিস্তান সৃষ্টির ক্ষেত্রে মুসলিম লীগের প্রধান পুঁজি ছিল ইসলাম ধর্ম। জামাত নেতা মওদুদীর তীব্র আপত্তি ছিল এ ধরনের রাষ্ট্র গঠনে। Nationalism and India গ্রন্থে তিনি তখন লিখেছিলেন, "এই তথাকথিত মুসলিম জাতীয় রাষ্ট্র স্থাপন ত্বরান্বিত করা মূর্খের মতো সময় নষ্ট করার নামান্তর, কেননা এই রাষ্ট্র উদ্দেশ্য সাধন না করে বরং আমাদের আরো বিঘ্ন সৃষ্টি করবে।" তাছাড়া, তাঁর মতে, "সতী-বেশ্যার পরস্পরবিরোধী চরিত্রের মতো···মুসলমান ও জাতীয়তাবাদীর মধ্যেও অমীমাংসেয় বৈপরীত্য রয়েছে।"

পাকিস্তান সৃষ্টির পর ১১ আগষ্ট, ১৯৪৭ করাচীতে পাকিস্তান সংবিধান সভায় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তাঁর উদ্বোধনী বক্তব্যে আধুনিক রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকারগুলোর পক্ষে উচ্চকিত হলেও রাষ্ট্র-সংগঠন থেকে এই প্রধান পুঁজি ধর্মকে পৃথক করা হয়নি। বরং তা শো কেসে সাজিয়ে রাখা হয় প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবহারের নিমিত্তে। এ সময় সংবিধান প্রণয়নকল্পে গণ পরিষদের পরামর্শদাতা হিসেবে বিবেচিত আলেমদের নিয়ে গঠিত 'তালিমাত-ই-ইসলামী বোর্ড'' কিছু সুপারিশ প্রদান করে। বোর্ডের মতে, রাষ্ট্রপতি হবেন মুসলমান, পুরুষ, ইসলাম ধর্ম শাস্ত্রাভিজ্ঞ, জুম্মা ও ঈদের নামাজের ইমাম। তিনি ফেডারেল পরিষদের সদস্য ও অভিজ্ঞ আলেমদের মাধ্যমে আজীবনের জন্যে নির্বাচিত হবেন। তিনি মন্ত্রী সভা ও কাউন্সিলের সংগঠক এবং প্রদেশের শাসন ব্যবস্থার নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রক। কাউন্সিল সরকারী বিল প্রণয়ন করবে তাঁর নির্দেশে। তবে মতবিরোধ দেখা দিলেও কার্যকর হবে রাষ্ট্র প্রধানের নির্দেশ। আইন পরিষদে কোনো মহিলা থাকতে পারবে না, কিন্তু 'যেহেতু এটি আধুনিক যুগ' সেজন্যে বোরখা পড়া পঞ্চাশোর্ধ মহিলাদের আইন পরিষদের সদস্য নির্ধারণ করা যেতে পারে বলে বোর্ড অভিমত দেয়। (তথ্য সূত্র: Leonaed Binder/Rcligion and Politics in Pakistan, Appendix)।

৩.১। অন্যদিকে পাকিস্তান রাষ্ট্রতত্ত্বের বিরোধিতাকারী আবুল আলা মওদুদী রাতারাতি পাল্টে ফেলেন তাঁর প্রাক্তন ধারণা। শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে 'আমাদের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সমস্যা' শীর্ষক পুস্তিকায় তিনি লেখেন "বলা হইয়াছিল: আমাদের এমন একটি দেশ চাই, যেখানে আমরা মুসলমানদের ন্যায় জীবন যাপন করিতে পারিব, ইসলামকে পুনর্জীবিত ও জাগ্রত করিতে পারিব এবং ইসলামের বুনিয়াদে এক নতুন তাহজীব ও তামাদ্দুনের প্রাসাদ গড়াইতে সমর্থ হইব। কিন্তু আল্লাহ যখন সেই দেশ আমাদের দান করিলেন, তখন ওয়াদা পুরণ করাতো দূরের কথা ইসলামের নাম নিশানা যাহা কিছু আজ পর্যন্ত বাঁচিয়াছিল তাহাও নিশ্চিহ্ন করা হইতেছে.....।" অতএব মওদুদী, এবং তাঁর সঙ্গে অন্যান্য ইসলামী রাষ্ট্রবিদরাও ইসলামী রাষ্ট্রের জন্যে জীবনপণ করে বসেন। এ আন্দোলনের এক পর্যায়ে ১৮ জানুয়ারি '৫৩তে করাচীতে ৩১ জন ওলেমার এক সম্মেলনে মওদুদী সফলতার সঙ্গে ধর্মীয় উত্তেজনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। পূর্ব-ঘোষিত ২২ দফার সঙ্গে 'কাদিয়ানীদের অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণা, কাদিয়ানী পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাফরুল্লাহ খানের পদচ্যুতি এবং সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় পদ থেকে কাদিয়ানীদের কর্মচ্যুতি এ তিনটি দাবি সংযুক্ত করেন তারা। মওদুদী 'কাদিয়ানী সমস্যা' নামে একটি পুস্তিকা লিখে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা আরো বাড়িয়ে তোলেন। এরই সূত্র ধরে মুসলমানিত্বের সংজ্ঞা নিয়ে ফেব্রুয়ারীর শেষ হতে মার্চের প্রথম সপ্তাহ '৫৩ পর্যন্ত পাঞ্জাবে এক ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি হয়। এতে শত শত কাদিয়ানী মৃত্যু বরণ করেন। মওদুদী এবং জামাতে ইসলামী একে 'সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রাম' রূপে অভিহিত করে।

৪. মুসলিম উপদলের রক্তাক্ত সংঘর্ষের প্রেক্ষিতে এ সময় একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। কমিটি একটি রিপোর্টও প্রণয়ন করে। বিভিন্ন ইসলামিক দল ও মওলানার লক্ষ্য এবং কর্মসূচী সংক্রান্ত এই 'তদন্ত রিপোর্ট' এখন ইসলামী রাষ্ট্রতত্ত্ব বিষয়ে গবেষকদের কাছে ধ্রুপদী নিদর্শন। কাদিয়ানী হত্যাকে কেন্দ্র করে সেই যে প্রথম পাকিস্তানে সামরিক আইন জারির প্রয়োজন সৃষ্টি হয়—যার ধারা এখনো বহমান।

৪.১ তদন্ত রিপোর্টের মতানুযায়ী (এরপর থেকে তদন্ত রিপোর্টের শুধু পৃষ্ঠা নং উল্লেখিত হবে।, "প্রত্যেক আলেমের মতো আমরাও যদি আমাদের নিজস্ব একটি সংজ্ঞা দিতে চাই এবং সে সংজ্ঞা যদি অন্যসব আলেমদের দেয়া সংজ্ঞা থেকে আলাদা হয়, তবে বিনা মতভেদে আমরা ইসলাম বহির্ভূত হয়ে যাই; এবং যদি আমরা যে কোন আলেমের সংজ্ঞা গ্রহণ করি, তা হলে তার মতে আমরা মুসলিম থাকি, কিন্তু অন্য সবার মতে কাফের হয়ে যাই" (পৃষ্ঠা ৪৯)। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ধর্মাবলম্বীদের ভেতর কি রকম মানববিধ্বংসী প্রবণতা গড়ে তোলে তা অনুভব করা যায় যখন তদন্ত আদালত মত প্রকাশ করে যে, "এ সবের মোট ফল এই দাঁড়িয়েছে যে শিয়া, সুন্নী, দেওবন্দী আহলে হাদিস, ব্রেলভি—কেউই মুসলিম নয়, ইসলামী রাষ্ট্রে ক্ষমতা এমন দলের হাতে থাকে যারা অন্য দলকে কাফের মনে করে"...(পৃষ্ঠা ৪৯)।

এই প্রেক্ষিতে তদন্ত আদালত মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ'র নীতি নির্ধারণী বক্তব্যে উক্ত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র সম্পর্কে আলেমদের মতামত চাইলে তারা তা প্রত্যাখ্যান করেন। এমন কি যে মওদুদী এক সময় নবগঠিত রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে লিখেছিলেন তিনি এ তদন্ত কমিটির সামনে এ ধরনের রাষ্ট্রকে 'শয়তানের সৃষ্টি' (পৃষ্ঠা ৩৬) হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

৪.২ 'শয়তানের সৃষ্টি'র বিপরীতে মওদুদীসহ অন্যান্য আলেমরা কি ধরনের রাষ্ট্র সৃষ্টি করতে চান, তার কিছু নমুনা দেখা যাক। প্রথমেই তারা সব রকম আইনকে নাকচ করে দেন এই যুক্তিতে যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হওয়াতে এমন কোনো বিষয় নেই যা কোরআন সুন্না ইজমা দ্বারা ব্যাখ্যা ও মীমাংসা করা যাবে না। অতএব নতুন কোনো আইন সৃষ্টির প্রশ্ন অবান্তর এবং 'কুফরী'র সমতুল্য।

কেউ কেউ কোরআন সুন্নায় বা পূর্ববর্তী ইজমায় অনুল্লেখিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে মতামত দিতে গিয়ে বলেছেন, এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি প্রাজ্ঞ আলেমদের নিয়ে 'উপদেষ্টা পরিষদ' গঠন করবেন। এই পরিষদ পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান কোরআন ও হাদীস হতে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বা বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা ও মীমাংসা খুঁজে বের করবেন অর্থাৎ 'ইজমা' প্রদান করবেন। এ কারণে "পাকিস্তানে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কোন সরকারেরই গণতান্ত্রিক চরিত্র থাকতে পারে না" বলে আলেমরা অভিমত দেন (পৃষ্ঠা ৪২)। আইন পরিষদের অস্তিত্বও ইসলামী রাষ্ট্রের পরিপন্থী কেননা "আইন পরিষদ গঠন কোরআন সুন্নার বিরোধী।"

(পৃষ্ঠা ৪৪)। ইসলামী রাষ্ট্রে আইন পরিষদের অনুপস্থিতির ব্যাখ্যা ইসলামী আইনে ইজমা প্রণয়নে একদিকে আলেম ও মুজতাহিদের একাধিপত্য এবং অন্যদিকে জনসাধারণের ভূমিকাহীনতার সঙ্গে সম্পর্কিত।

মাওলানা ও আলেমদের এই ধর্মরাষ্ট্রে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা থাকবে দমননীতির আওতায়। "ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের মর্যাদা হবে জিম্মির মতো। তারা রাষ্ট্রের সত্যিকার নাগরিক হবে না, কেননা তারা মুসলমানদের মতো সমান অধিকার ভোগ করবে না। আইন তৈরির ব্যাপারে বা আইন কার্যকর করার বেলায় তাদের কোন অধিকার থাকবে না। সরকারি চাকুরী করাও হবে তাদের পক্ষে হবে নিষিদ্ধ (পৃষ্ঠা ৪৪)।"

আলেমাদের দাবি অনুযায়ী ইসলামী রাষ্ট্র মানেই দারুল ইসলাম—যা মুসলিম শাসক কর্তৃক ইসলামী আইন কানুনের অধীনে পরিচালিত হবে। মুসলমান ছাড়া আর কেউ এই মূলনীতি সাপেক্ষে এখানে বসবাসের অধিকার পেলেও পূর্ণ নাগরিকত্ব পাবেন না। তা'ছাড়া সেই সব অমুসলিমরাই এখানে বসবাসের স্বীকৃতি পাবেন যারা কিতাব অনুসারী এবং মূর্তিপূজক নয় (পৃষ্ঠা ৫০)।

এর সোজা অর্থ, ইসলামী দেশ থেকে সমস্ত হিন্দুদের উচ্ছেদ করা হবে। সঙ্গে সঙ্গে অধিকারহীন করা হবে অন্যান্য ধর্মবলম্বীদের। ধর্মীয় নীতির এই অযৌক্তিকতা বিশেষতঃ ভারতে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে তার মীমাংসা হিসেবে জমিয়তুল উলামায়ে পাকিস্তানের সভাপতি এবং জামাতে ইসলামী সভাপতি পাকিস্তানে ধর্মরাজ্য গঠনের পথকে অনুসরণ করে ভারতকেও পরামর্শ দেন ধর্মরাজ্য গঠনের। তারা, এমনকি সে রাষ্ট্রে মনু'র আইন অনুসারে মুসলমানদের শূদ্রের ন্যায় অধিকারহীন ও নির্যাতন করার অধিকারও হিন্দু শাসকদের হাতে তুলে দেন (পৃষ্ঠা ৫২-৫৩)।

একজন মাওলানা অবশ্য এর বিরোধিতা করে বলেছেন, পাকিস্তানে ইসলামী ধর্মরাজ্য গঠনের প্রেক্ষিতে ভারতে হিন্দু ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলে এবং মুসলমানদের ধর্মীয় অধিকার হরণ করা হলে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করবেন (পৃষ্ঠা ৫৪)। শুধু এই 'জেহাদী' মওলানাই নয় অন্য মাওলানারাও মনে করেন যে "থিওরী অনুসারে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিবেশী অমুসলিম রাষ্ট্রের সঙ্গে অনুক্ষণ যুদ্ধে লিপ্ত। প্রতিবেশী রাষ্ট্র যে কোন সময় দারুল-হরবে পরিণত হতে পারে, এবং সে ক্ষেত্রে সেখানকার মুসলিম অধিবাসীদের কর্তব্য হবে সে দেশ ছেড়ে ইসলামী রাষ্ট্রে চলে আসা।...পাকিস্তান যদি ইসলামী রাষ্ট্র হয় এবং ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের যুদ্ধ বাঁধে, তবে ভারতের চার কোটি মুসলমানকে পাকিস্তানে জায়গা দেয়ার জন্য আমাদের তৈরি থাকতে হবে। প্রকৃতপক্ষে জমিয়তুল উলামায়ে পাকিস্তানের সভাপতি...মনে করেন ভারতের মুসলমানদের এখনই হিজরত করা উচিত (পৃষ্ঠা ৫৪)।"

নিজেদের দেশে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার অযৌক্তিক আকাঙ্খায় যারা সমগ্র পৃথিবীতে স্বধর্মীদেরকে উদ্বাস্তু করে ছড়েতে চায়, তাদেরকে আর যাই হোক ধার্মিক বলা যায় না।

৪.৩ ইসলামী রাষ্ট্রের পাকিস্তানী প্রবক্তারা তদন্ত কমিটিকে আরো কি কি বলেছেন দেখা যাক। "এসলামী রাষ্ট্রের অন্যান্য ব্যাপার হচ্ছে, সব রকমের ভাস্কর্য, তাস খেলা, মানব প্রতিকৃতি অঙ্কন, মানুষের আলোকচিত্র তোলা, গান-বাজনা, নাচ, পুরুষ নারীর মিলিত অভিনয়, সিনেমা এবং থিয়েটার বন্ধ করতে হবে (পৃষ্ঠা ৫৫)।" আলেমদের কথা শুনলে সমস্ত হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ বন্ধ করে দিতে হবে। অথবা চিকিৎসাশাস্ত্রে সম্পর্কিত গবেষণা করতে হবে অমুসলিমদের হত্যা করে কিংবা তাদের মৃতদেহ দিয়ে। কেননা "মুসলমানদের মৃতদেহ কেটে ছাত্রদেরকে গঠন বুঝিয়ে অস্থিবিদ্যার অধ্যাপকেরা পাপের কাজ করে থাকেন" (পৃষ্ঠা ৫৫)।

৫. ইতিহাস সব সময়েই কিছু নিষ্ঠুর ব্যঙ্গেরজনক। একদা ইসলাম ধর্মে হযরত মূসা (আঃ) এবং হযরত ঈশা (আঃ)-কে আল্লাহ্'র প্রেরিত প্রতিনিধি হিসেবে সম্মানিত করা হয়েছিল। আজ সেই ইসলামের তথাকথিত ধ্বজাধারী গোলাম আযম, আব্বাস আলী খান, মতিউর রহমান নিজামী, দেলোয়ার হোসেন সাঈদীরা উচ্চকিত হযরত মূসা (আঃ) এবং হযরত ঈশা (আঃ) প্রচারিত ধর্ম ইহুদী ও খৃষ্টানবাদের বিরুদ্ধে। একদা 'কাদিয়ানী সমস্যা'কে কেন্দ্র করে সারা পৃথিবী আলোড়িত হয়েছিল। উপমহাদেশের মানুষেরা উপলব্ধি করেছিল ধর্ম আর যা-ই হোক রাষ্ট্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে পারে না। অথচ তারপরেও বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহ একাত্তর এসেছে, ধর্মের নামে বৈধ করার চেষ্টা করা হয়েছে রাষ্ট্র কর্তৃক চাপিয়ে দেয়া গণহত্যা, নির্যাতন ও ধর্ষণকে। আর এত বড় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরেও গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে রাজনৈতিক দল গঠনেরও তৎপরতা চালানোর অনুমতি দেয়া হয়েছে অগণতান্ত্রিক ধর্মভিত্তিক সংগঠনগুলোকে। এরপর রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবেও ঘোষণা করা হয়েছে।

যে সব রাজনৈতিক দল, শ্রেণী ও পেশার সংগঠন সে সময় রাষ্ট্রধর্মের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিল তারা পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে নিশ্চুপ হয়ে গেছে। এমনকি আইনজীবীদের বিগত নাগরিক গণ-আন্দোলনে ইতিবাচক ভূমিকার কথা স্বীকার করে নিয়েও বলা যায়, ৯ম সংশোধনীর মাধ্যমে আইন, আইনজীবী ও আইনের শাসনকে অবজ্ঞা করায় তারা হাইকোর্ট পর্যন্ত আইনী পদ্ধতিতে সংগ্রাম করে বিজয়ী হয়ে 'ঐতিহাসিক গণতান্ত্রিক বিজয়ের' উল্লাসে ফেটে পড়েছিলেন। অথচ সেই সংশোধনীরই আরেকটি অংশ এই 'রাষ্ট্রধর্ম বিল' সম্পর্কে তাদের ভূমিকা ছিল খুবই সাধারণ। পেশার স্বার্থ, শ্রেণীর স্বার্থই যে বড় স্বার্থ, এই ঘটনা তারই একটি উদাহরণ।

অনন্তর কাল প্রবাহে আবারো যে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার কিংবা কতল করার নিষ্ঠুর ঐতিহাসিক ব্যঙ্গ ফিরে আসবে তাতে আর সন্দেহ কি!

(অবশিষ্টাংশ ২৬ পৃষ্ঠায় দেখুন)

পাখির চোখে দেখা

আগুন নিয়ে খেলার পরিণাম ভালো হয় না

সামসুর রাহমানের কলাম

"যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযম, যার নাগরিকত্বের প্রশ্নটি এখনো অমীমাংসিত, আবার রাজনীতির মাঠে নেমে পড়েছেন। জামাতে ইসলামী এই ধিকৃত মানুষটিকে নিজেদের ঘাঁটি সাতক্ষীরায় নিয়ে সেখানে তাণ্ডব সৃষ্টি করেছে। জনসাধারণ গোলাম আযমের উপস্থিতি মেনে নিতে পারেননি। তারা ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। পড়াটাই স্বাভাবিক এবং ন্যায়সঙ্গত। জামাতে ইসলামীর কর্মিসভাকে কেন্দ্র করে জামাত-শিবির চক্র এবং জনসাধারণের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে প্রায় সহস্রাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছেন। জামাত কর্মীদের হামলা, বোমাবাজি ও লাঠির আঘাতে সাতক্ষীরার ম্যাজিস্ট্রেট, ওসিও রেহাই পাননি। জামাতের কর্মী-সমর্থকরা বিএনপির মহিলা এমপি ফরিদা রহমানের বাড়ি, জেলা আওয়ামী লীগ, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, আইনজীবী সমিতির কার্যালয়সমূহ এবং আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির নেতা-কর্মীদের বাড়িঘর ও দোকানপাটে হামলা চালায়।

জামাতীদের এই তাণ্ডবের নিন্দার ভাষা আমাদের জানা নেই। যে ব্যক্তির নাগরিকত্বের প্রশ্ন এখনো মীমাংসিত হয়নি, তিনি সভায় বক্তৃতা করেন কী করে? সরকার কীভাবে এই বেআইনী ব্যাপারকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন? না আমার প্রশ্ন অর্থহীন। কারণ, বিএনপি সরকার তো গোড়া থেকেই তোয়াজ করে চলছে জামাতী নেতাদের। কিন্তু সাতক্ষীরার জনসাধারণ উচিত জবাব দিয়েছেন জামাতীদের। তাদের প্রতিরোধের মুখে গোলাম আযম তার কর্মসূচী অসমাপ্ত রেখে সাতক্ষীরা থেকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন। এই যে সাতক্ষীরার সাধারণ মানুষ জামাতী নেতা গোলাম আযমকে কর্মসূচী সম্পন্ন করতে দেননি, সেজন্য তাদের সাধুবাদ জানাতে হয়।

এদিকে আবার পাকিস্তান ভিত্তিক তাহাফফুজে খতমে নবুয়ত নামে মৌলবাদী প্রতিষ্ঠানের এ দেশীয় সদস্যারা কাদিয়ানীদের বাংলাদেশে অমুসলিম ঘোষণার দাবিতে দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করার পাঁয়তারায় মশগুল হয়েছে। সরকারের ওপর তারা চাপ সৃষ্টি করছে যাতে সরকারীভাবে এদেশের কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করা হয়। তারা সচিবালয় ঘেরাও করেও নাহক জনগণকে দুর্ভোগের শিকারে পরিণত করছে। পাকিস্তানে তারা কাদিয়ানীদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে এবং সেখানে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার ব্যাপারে সফল হয়েছে। আমাদের দেশেও এরা পাকিস্তানী কায়দায় কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করিয়ে ছাড়তে বদ্ধ পরিকর। সচিবালয় ঘেরাও-এর নেতৃত্ব দিয়েছেন

বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের জামাত সমর্থক খতিব। আসলে তাহাফুজে খতমে নবুয়ত নিয়ে তিনিই বেশি মাতামাতি শুরু করেছেন। এই মৌলবাদীদের তৎপরতায় এখানকার নিরীহ কাদিয়ানীদের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছে। কাদিয়ানীরা কারো বাড়া ভাতে ছাই দিতে যাননি। তারা কারো সাতে পাঁচে নেই। তারা নিজেদের বিশ্বাস নিয়ে আছেন, সেই বিশ্বাস কারো ওপর চাপিয়ে দিতেও আগ্রহী নন। তারা মুসলিম কি অমুসলিম তা বিচার করার অধিকার কোনো ব্যক্তির নেই। একটি রাষ্ট্রে সকল নাগরিকের সমান অধিকার রয়েছে। এই অধিকার ক্ষুন্ন করতে যদি কেউ তৎপর হয় তাহলে দায়িত্বশীল প্রশাসনকে সেই অধিকার হরণকারী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দুঃখের বিষয়, সরকার মৌলবাদীদের তৎপরতা রোধ করার উদ্দেশ্য কোনো পদক্ষেপ তো গ্রহণ করেই না, বরং ওদের প্রশ্রয় দেয়। সরকারের প্রশ্রয়েই, বলা যায়, ফতোয়াবাজ মৌলবাদীদের ঔদ্ধত্য এবং অশুভ তৎপরতা বেড়েই চলেছে। তাদের দৌরাত্ম্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের জীবন অতিষ্ট হয়ে উঠেছে। এইসব মৌলবাদী ফতোয়াবাজরা দেশের মানুষের অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তিত নয়, এরা বিবি তালাক, কাদিয়ানীরা অমুসলিম, কোন লেখক মুরতাদ-এসব নিয়েই মেতে আছে।

ফতোয়াবাজিতে বিপন্ন এনজিও কর্মীগণ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। ব্রাক-প্রতিষ্ঠিত বহু স্কুল পুড়িয়ে দিয়েছে ফতোয়াবাজরা। এনজিওতে যেসব মহিলা কাজ করছেন, কিংবা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে ছোট খাটো ব্যবসা করছেন তাদের একঘরে করা হচ্ছে। তাদের তালাক দেওয়ার জন্য স্বামীদের বাধ্য করা হচ্ছে। এনজিওদের মিথ্যা অপবাদ দিয়ে, তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা রটিয়ে ফতোয়াবাজরা গ্রামাঞ্চলের সরল, নিরক্ষর মানুষদের ভড়কে দিচ্ছে। এনজিও-প্রতিষ্ঠিত স্কুলে বেশি করে ছাত্রছাত্রী পড়ার সুযোগ পাওয়ায়, মেয়েরা শিক্ষালাভের সুবিধা পাওয়ায় স্বার্থান্বেষী ফতোয়াবাজদের আঁতে ঘা লাগছে। কোনো কোনো এলাকায় মাদ্রাসার ছাত্র কমে যাচ্ছে। তারা আধুনিক শিক্ষা লাভের আগ্রহী। তারা পরজীবী হয়ে থাকতে চায় না। তাই স্কুলের প্রতি অধিকতর মনোযোগী হয়েছে ছেলেরা। ফলে ফতোয়াবাজ মোল্লারা ভাবছে তাদের রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। যারা চড়া সুদের বিনিময়ে মানুষকে টাকা ধার দেয় তারা চায় না যে কেউ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিক। তাহলে তাদের মুনাফায় ভাটা পড়বে। এরাও ফতোয়াবাজদের উসকে দিচ্ছে যাতে এনজিওগুলো গ্রামে কাজ করতে না পারে। এনজিওতে যারা কর্মরত তাদের প্রতিও হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে ফতোয়াবাজি। এনজিও সম্পর্কে কারো কারো সমালোচনা থাকতে পারে। কিন্তু তারা যে শিক্ষা বিস্তারে এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। ফতোয়াবাজরা যেভাবে কোমর বেঁধে এনজিও কর্মীদের বিরুদ্ধে লেগেছে তা কোনো বিবেক-

বান, শিক্ষিত মানুষ সমর্থন করতে পারে না। যে বাড়ির মেয়েরা এনজিও প্রতিষ্ঠিত স্কুলে যায়, সে বাড়ির লোকজনকে একঘরে করলে, সেই অন্যায় আচরণ কি কেউ সমর্থন করতে পারে। কোনো কোনো স্থানে এনজিও কর্মীর কাছ থেকে জরিমানা আদায় করেছে ফতোয়াবাজরা, এরকম খবরও প্রকাশিত হয়েছে কোনো কোনো জাতীয় দৈনিক পত্রিকায়। ফতোয়াবাজরা নারী নির্যাতনে বেশ দড়। দেশের কোনো কোনো অঞ্চলে নারীদের বিরুদ্ধে ফতোয়াবাজী করে কাউকে ঝাঁটা পেটা করা হচ্ছে, আবার কাউকে কাউকে মারা হচ্ছে দোররা।

মোট কথা, এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে ফতোয়াবাজরা। মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিরোধ গড়ে তোলা দরকার। নইলে এরা সারা দেশকে আইয়ামে জাহেলিয়াতের দিকে ঠেলে দেবে; দেশবাসীকে মধ্যযুগীয় অন্ধকারে বসবাস করতে বাধ্য করবে। এদের অশুভ তৎপরতার ফলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিরও অবনতি হতে বাধ্য। সরকারকে এই বিষয়ে নিক্রিয় থাকলে চলবে না। আগুন নিয়ে খেলার পরিণাম ভালো হয় না কখনো। ফতোয়াবাজরা আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটালে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে বলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আশ্বাস দিয়েছে। এই আশ্বাসবাণী যাতে শুধু কথায় কথা না হয়, সেদিকে অবশ্যই নজর রাখতে হবে। সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে, যেন কোনো নিরীহ নাগরিক, তিনি কাদিয়ানীই হোন কিংবা যে কোনো সাম্প্রদায়ভুক্ত হোন, নির্যাতন ও নিগ্রহের শিকারে পরিণত না হন। যদি এক্ষেত্রে নিক্রিয়তা প্রশ্রয় পায় তাহলে সরকার জনসাধারণের সীমাহীন ধিক্কার কুড়াবে"।

(৩/৪/৯৪ তারিখের দৈনিক ভোরের কাগজের সৌজন্যে)

(২৩ পাতার পর)

অতএব একটি অনিবার্য নিয়তির জন্যেই প্রস্তুতি নিতে পারি আমরা, যারা ধর্মকেন্দ্রিক রাজনীতির বিরোধী, যারা মনে করি রাষ্ট্র ধর্মকে ব্যবহার করে রাষ্ট্রীয় শ্রেণী উদ্যোগগুলিকে বৈধ করার চেষ্টা করে। ১৯৫৩ এর 'কাদিয়ানী বিরোধী' সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরে মওদুদী মৃত্যুদণ্ডাদেশ পেলেও তা কার্যকর হয়নি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর চাপে। এবারে সরকারি নিরবতায়, ক্ষমতা বহির্ভূত বুর্জোয়া দলগুলোর নিক্রিয়তায়, সাম্প্রদায়িক দলগুলোর উস্কানিতে শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি যদি ১৯৫৩ এর মতো ভয়াবহই হয় তবে নব্য মওদুদীরা যেনো রেহাই না পায়। প্রগতিশীল দলগুলোর সাংগঠনিক বিন্যাসকে অবিলম্বে যে সব বিষয়ের জন্যে সাজাতে হবে সেগুলোর মধ্যে এই অনিবার্য নিয়তি প্রসঙ্গও অন্যতম।

(১/৪/৯৪ইং তারিখের সাপ্তাহিক সময় পত্রিকার সৌজন্যে)

আহমদিয়া জামাতের আমীর মোস্তফা আলী বলেন

দলিল প্রমাণ ছাড়া আমাদের অমুসলিম হিসেবে ফতোয়া দিচ্ছে

"বাংলাবাজার রিপোর্ট : আহমদিয়া মুসলিম জামায়াতের ন্যাশনাল আমির মোহাম্মদ মোস্তফা আলী বলেছেন, দেশে প্রতিক্রিয়াশীল মৌলবাদী শক্তি কোন রকম দলিল প্রমাণ ছাড়া আমাদের অমুসলিম হিসেবে ফতোয়া দিচ্ছে। আমরা তাদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে কোরআন সুন্নাহ-হাদিস ভিত্তিক বিতর্কে যেতে রাজি আছি।

তিনি গতকাল সংবাদিকদের সাথে আলাপকালে এ কথা বলেন। বিকেল ৩টায় আহমদিয়া জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন ধর্মান্ধ ও ধর্ম ব্যাবসায়ীদের জনগণ বর্জন করায় তারা আহমীদের নিয়ে সাম্প্রদায়িক ইস্যু তৈরির মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করার চেষ্টা করছে। তারা কাদিয়ানি বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে দেশে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা বাধানোর অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

তিনি বলেন, ইদানিং সরকার থানাগুলোতে মৌখিক নির্দেশ দিয়েছে। স্ব স্ব এলাকায় আহমদীদের সংখ্যা অবিলম্বে ঢাকায় পাঠাতে হবে। এতে আমরা অস্বস্তি বোধ করছি। যদি শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানএর উদ্দেশ্য হয় তবে হাতে গোনা বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী মোল্লাদের পরিসংখ্যান নেয়াই উচিত। বিশৃংখলাকারীদের বাদ দিয়ে নির্যাতিতদের সংখ্যা গণনা করা আমাদের সতর্ক সংকেত দিচ্ছে।

তিনি বলেন, আহমদীদের অমুসলিম ঘোষণার দাবিকে একটি মহল আগামী নির্বাচনে একটি অনুঘটক ইস্যু দাঁড় করানোর পাঁয়তারা করছে।

তিনি বলেন, অমুসলিম ঘোষণার মাষ্টার প্লান পাকিস্তান থেকে এসেছে। এ ব্যাপারে পাকিস্তান অনুসৃত কোর্সটি অনুসরণ শুরু করেছে। টাকার উপর তারা 'কাদিয়ানি কাফের' সীল মেরে সর্বত্র ছড়িয়ে দিচ্ছে।

তিনি বলেন, পাকিস্তানে অমুসলিম ঘোষণার পর শতাধিক আহমদীকে নির্বিচারে হত্যা এবং তাদের শতাধিক মসজিদ ভাঙা হয়েছে। এদেশেও তেমান রক্তগঙ্গা বইয়ে দেয়ার পাঁয়তারা চলছে।

তিনি বলেন, আমাদের অধিকার আছে নিজেদের মুসলমান বলার। অন্য কোন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠি যদি আমাদের কাফের বলে, সে জন্যে তারা আল্লাহ্‌র দরবারে দায়ী

থাকবেন। কেননা, তিনিই ফয়সালার মালিক। তিনি বলেন, আমাদের বিরুদ্ধবাদী গোষ্ঠির নেতারা আমাদের বই পুস্তক পুড়ানো, জবাইকরণ, আস্তানা উচ্ছেদ করতে চাইছেন। এর অধিকার তাদের কে দিয়েছে? তারা আমাদের সরকারি গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে অপসারণ এবং এদেশ থেকে বের করে দিতে চাইছেন। এর রহস্য কি? আমরা সকলেই এ দেশের জন্মগত নাগরিক এবং বাংলাদেশী মুসলমান। আমরা বিদেশী নই।

পরে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের শীর্ষ নেতারা সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। এতে অংশ নেন আহমদ তওফিক চৌধুরী, আবদুল আওয়াল চৌধুরী। একজন সাংবাদিক জানতে চান, আপনাদের সামনে কোরআন শরীফ আছে। বলুন তাতে কত আয়াত ও শব্দ?

উত্তর: আমরা ঘোষণা দিতে চাই, রসুল (সা:)-এর উপর নাজিলকৃত কোরআন শরীফে যতো আয়াত ও শব্দ রয়েছে এতে সেই সংখ্যা অবিকৃত রয়েছে। কিছু বাদও পড়েনি। যোগও হয়নি।

প্রশ্ন: পাকিস্তান বাদে অন্য কোথাও কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করা হয়েছে কিনা?

উত্তর: একমাত্র পাকিস্তানে হয়েছে অন্য কোথাও নয়।

প্রশ্ন: আপনারা ইমাম মাহদীর পরে আলাইহিস সালাম বলেন কেন?

উত্তর: রসুল করিম (সা:) নিজেই বলেছেন, ইমাম মাহদী এলে তাকে আমার সালাম পৌঁছে দিও।

প্রশ্ন: আপনাদের অমুসলিম ঘোষণা করলে আপনারা কি তা মেনে নেবেন?

উত্তর: কখনো নয়। আমরা মনে করি ইসলামই শেষ ধর্ম ও সর্বশেষ শরীয়ত। নতুন কোন ধর্ম বা শরীয়ত আসবে না। আমরা সুস্পষ্টভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর উম্মত। আমাদের খলিফা মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি উম্মতে মুহাম্মদ। তিনি নতুন কোন কিছুই করেননি। তিনি কোরআনের শিক্ষাকে পুনরুজ্জীবিত ও পুর্নবাসিত করেছেন।

প্রশ্ন: আপনারা কি সরকারের কাছে নিরাপত্তা চেয়েছেন?

উত্তর: আমরা বিগত ২৪ ডিসেম্বরের আগে প্রেসিডেন্টের এপয়েন্টমেন্ট চেয়েছিলাম। তিনি ৬ ফেব্রুয়ারি সময় দেন। আমরা তখন নিরাপত্তা দাবি করে স্মারকলিপি দেই। তিনি নিরব থাকেন। জিজ্ঞেস করেন, এদেশে আপনাদের সংখ্যা কত?

নেতৃবৃন্দ জানান, ২৯ অক্টোবর ৯২-এ আমাদের কমপ্লেক্সে আক্রমণের পর এ ব্যাপারে পুলিশি তদন্ত আজও তেমন এগোয়নি। তারা ১০জনকে আটক করে পরে ছেড়ে দেয়"।

(১-৪-৯৪ তারিখের দৈনিক বাংলা বাজার পত্রিকার সৌজন্যে)

আহমদীয়া নেতাদের অভিযোগ

কাদিয়ানী বিরোধিতার নামে দেশে দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধানোর চেষ্টা হচ্ছে

"কাগজ প্রতিবেদক : আহমদীয়া মুসলিম জামাতের নেতৃবৃন্দ বলেছেন, কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে দেশে এক রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা বাধানোর অপচেষ্টা চলছে। হত্যা করা, সম্পদ লুণ্ঠন, জীবনকে দুর্বিষহ করা ঐ তথাকথিত আন্দোলনকারীদের প্রধান উদ্দেশ্য। অমুসলিম ঘোষণার দাবি বাহানা মাত্র। তাই এখনই এ বিষয়ে দেশবাসীকে সাবধান ও সোচ্চার হতে হবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বকশী বাজার রোডস্থ আহমদিয়া মুসলিম জামাত কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ এ কথা বলেন। এ সময়ে বাইরে ককটেলের শব্দ শোনা যায়।

সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করা হয়, গত ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে পাকিস্তান থেকে আমদানিকৃত তাহাফফুজে খতমে নবুয়ত নামক সংগঠনের মৌলভীগণ দেশের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা বিবৃতি প্রদান করেন। পরে ঢাকায় তারা একটি প্রশিক্ষণ কোর্সও পরিচালনা করেন। এই পাকিস্তানী কোর্সটি আর কিছু নয়, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিরুদ্ধে তারা পাকিস্তানে যে সব পদ্ধতি ও চাল অবলম্বন করেছিল এবং করছে সেগুলো বাংলাদেশে রপ্তানির মাধ্যমে প্রয়োগ করা। নিজেরা ছলচাতুরী করে একটি অঘটন ঘটিয়ে নিরীহ আহমদীদের ওপর দোষ আরোপ করাটাও পাকিস্তানী মৌলভীদের অভ্যাস। সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করা হয় গত ২৩শে মার্চে রাতে বিরুদ্ধবাদীরা আহমদিয়া মসজিদের সামনে ককটেল ফাটিয়ে তাদের বিরুদ্ধেই এলাকায় অপবাদ রটাতে চেষ্টা করে।

সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ বলেন, পাঞ্জাব প্রদেশের সাবেক সাংসদ ও পাকিস্তানের খতমে নবুয়ত মুজাহিদ মাওলানা মনজুর চিনয়ুট সম্পর্কে তার এলাকাবাসীর প্রচুর অভিযোগ রয়েছে। এই মওলানা মনজুর গত ডিসেম্বরে বাংলাদেশে এসে বক্তৃতা করেন ও জানুয়ারিতে ঢাকায় খতমে নবুয়তের কোর্সে প্রশিক্ষণ দেন। পাকিস্তানেও তিনি ফতোয়াবাজ হিসেবে বিশেষভাবে ধিকৃত।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ইসলাম রক্ষার জিকির তুলে সংবিধানে সংশোধনী আনার দাবি নিছক কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলন নয়, বরং দেশ ও জাতিকে বিভক্ত করার একটি হীন চক্রান্তও, যার ফলে দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা সর্বোপরি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হবে।

এক প্রশ্নের জবাবে নেতৃবৃন্দ বলেন, আহমদিয়াদের অমুসলিম ঘোষণা করলেই তারা মেনে নেবেন না। সংবিধানে সকলের ধর্মমতের অধিকার সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। তারা ইতিমধ্যে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করে সার্বিক নিরাপত্তা চেয়েছেন বলে জানান।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর ন্যাশনাল আমীর মোহাম্মদ মোস্তফা আলী প্রমুখ"।

(১/৪/৯৪ তারিখের দৈনিক ভোরের কাগজের সৌজন্যে)

আহমদীয়া নেতৃবৃন্দের অভিযোগ

দেশে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা বাধানোর অপচেষ্টা চলছে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

"কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের সংগঠন 'আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ'-এর নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেছেন যে, কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে দেশে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা বাধানোর অপচেষ্টা চলছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সংগঠনের বকশীবাজারস্থ অফিসে আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ এ অভিযোগ করেন। এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনের জাতীয় আমীর মোহাম্মদ মোস্তফা আলী। এ ছাড়া নায়েব আহমদ তৌফিক চৌধুরী ও মৌলানা আবদুল আওয়াল খান চৌধুরী সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দেন।

মোস্তফা আলী বলেন, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কয়েকটি নির্বাচন এবং সমাবেশের মাধ্যমে পরিষ্কার হয়ে গেছে এদেশে ধর্মান্ধ ও ধর্ম ব্যবসায়ী মৌলবাদীদের স্থান দ্রুত সংকুচিত হয়ে আসছে, জনগণ তাদেরকে বর্জন করেছে। একথা উপলব্ধি করে তারা নতুন চালে আহমদীয়া বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

তিনি বলেন গত ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে পাকিস্তান থেকে আমদানীকৃত খতমে নবুওয়তের মৌলভিগণ দেশের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দেয়া ছাড়াও ঢাকায় একটি প্রশিক্ষণ কোর্সও পরিচালনা করেন।

লিখিত বক্তব্যে আরো বলা হয়, কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলন দেশ ও জাতিকে বিভক্ত করার চক্রান্তও বটে, যার পরিণতিতে দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীত বিনষ্ট হতে পারে। একটি নির্বাচিত সরকারের পক্ষে অশান্তি সৃষ্টিকারী এই মুষ্টিমেয় লোকদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে বাধা কোথায় ?

প্রশ্নোত্তরকালে নেতৃবৃন্দ বলেন, আমাদেরকে কেউ কাফের বলতে চাইলে বলুক কিন্তু ধর্মপালনে আমদেরকে তারা বাধা দিতে পারে না। তারা আরো বলেন, তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করা হলে তা মেনে নেয়া হবে না। বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী কোনভাবেই তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করা যায় না, করতে হলে সংবিধান সংশোধন করতে হবে।

নেতৃবৃন্দ জানান, গত ৬ই ফেব্রুয়ারি তারা রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করে তাদের জান-মালের নিরাপত্তা চেয়ে এসেছেন"।

(১/৪/৯৪ইং তারিখের দৈনিক সংবাদের সৌজন্যে)

সাংবাদিক সম্মেলনে কাদিয়ানী নেতৃবৃন্দ

ওরা দেশে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিতে চায়

"বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ৩ আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের নায়েব ন্যাশনাল আমীর আহমেদ তৌফিক চৌধুরী বলেন, কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করাটা আন্দোলনকারীদের মূল উদ্দেশ্য নয়, খুন খারাবির মাধ্যমে দেশে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেয়াই তাদের মূল উদ্দেশ্য।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে বকশীবাজার আহমদীয়া মুসলিম জামাত মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি একথা বলেন। মূল বক্তব্য পাঠ করেন ন্যাশনাল আমীর মোহাম্মদ মোস্তফা আলী। অন্যান্যের মধ্যে মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, গত ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে পাকিস্তান থেকে আমদানীকৃত খতমে নবুওয়তের মৌলভীরা দেশের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা-বিবৃতি প্রদান করে। পরে ঢাকায় একটি খতমে নবুওয়ত প্রশিক্ষণ কোর্স করা হয়। এসব বক্তৃতা-বিবৃতি ও কোর্স আর কিছুই নয়। পাকিস্তানে তারা যে সব পদ্ধতি ও চাল চেলেছিল সেগুলো বাংলাদেশে রফতানীর মাধ্যম মাত্র।

এতে আরো বলা হয় মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে দেশে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। পাকিস্তানের দৈনিক হায়দার, 'ডন' এবং দৈনিক জং পত্রিকার উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয় খতমে নবুওয়তের আমন্ত্রণে বাংলাদেশে আসা মৌলভী আল্লাহ ওয়াসায়া পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশে আদালত কর্তৃক 'টাউট' হিসেবে ঘোষিত এবং সেখানে কোনো সরকারী অফিস-আদালতে তার প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া মৌলানা মঞ্জুর আহমদ চিনিয়াটি ধর্মের নামে মানুষকে প্রতারণা এবং ফতোয়াবাজ হিসেবে চিহ্নিত।

এক প্রশ্নের উত্তরে মাওলানা আবদুল আউয়াল বলেন, সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র পাকিস্তান ছাড়া বিশ্বের আর কোথাও কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করা হয়নি। তিনি জানান, গত ৬ই ফেব্রুয়ারি ন্যাশনাল আমীর সাহেব ৭ জন প্রতিনিধিসহ রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং লিখিতভাবে প্রায় লক্ষাধিক কাদিয়ানীর জানমালের নিরাপত্তা বিধানের আবেদন জানান।

অপর প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, এত একশ' বছর ধরেই একশ্রেণীর মৌলানা কাদিয়ানীদের অমুসালম বলে বেড়াচ্ছে। এতে আমরা কাফের হয়ে যাইনি কারণ কে কাফের আর কে নয় তা একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন। কোনো মুসলমান অপর কাউকে কাফের বলতে পারে না"।

(১-৪-৯৪ইং তারিখের দৈনিক দিনকাল পত্রিকার সৌজন্যে)

বকশীবাজারে সাংবাদিক সম্মেলন

আহমদিয়া সম্প্রদায়ের জানমালের নিরাপত্তা বিধানের আহ্বান

।। ষ্টাফ রিপোর্টার ।।

"আহমদিয়া মুসলিম জামায়াত বাংলাদেশ সরকারের কাছে নিজেদের জানমালের নিরাপত্তা দাবী করে বলেছে, পাকিস্তান ভিত্তিক একটি মৌলবাদী চক্র কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে দেশে এক রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা বাধানোর অপচেষ্টা চালাচ্ছে। কোন অপশক্তিই যাতে এদেশে ধর্মের দোহাই দিয়ে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিতে না পারে সে জন্যে এখন দেশবাসীকে সাবধান ও সোচ্চার হতে হবে।

গতকাল বিকেলে বকশীবাজারস্থ আহমদিয়া মুসলিম জামায়াত মিলনায়তনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের ন্যাশনাল আমীর বলেন, কে কাফের বা প্রকৃত মুসলমান তা আল্লাহই নির্ধারণ করবেন। জোর করে চাপিয়ে দেয়া কোন সিদ্ধান্তই আমরা মেনে নেব না এবং এ জন্যে উদ্ভূত যে কোন পরিস্থিতির জন্যেই সরকার দায়ী থাকবে। সাংবাদিক সম্মেলনে আরও বক্তব্য রাখেন আহমেদ তৌফিক চৌধুরী ও মৌলানা আবদুল আওয়াল খান চৌধুরী। পবিত্র কুরআন পাঠের মাধ্যমে সাংবাদিক সম্মেলনের সূচনা করে মোহাম্মদ মোস্তফা আলী বলেন, পাকিস্তান ভিত্তিক মজলিসে তাহফুজে খতমে নবুওতের অন্তরালে প্রতিক্রিয়াশীল মৌলবাদ শক্তি সমাজে সাম্প্রদায়িক আগুন ছড়ানোর অপচেষ্টা শুরু করেছে। ১৯৫৩ সালেও একই কায়দায় পাকিস্তানে বহু হত্যাসহ অঘটন ঘটানো হয়েছিল। আহমদিয়া মুসলিম জামায়াতের বিরুদ্ধে তারা পাকিস্তানে যেসব পদ্ধতি ও কূটকৌশল অবলম্বন করেছিল এবং করছে এখন সেগুলোই বাংলাদেশে প্রয়োগ করা হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন এলাকায় বসবাসরত আহমদীদের পরিসংখ্যান সংগ্রহের সরকারি তৎপরতায় উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, এ পরিসংখ্যান আমাদের কাছে কেবল মৌখিকভাবেই চাওয়া হয়েছে—লিখিতভাবে নয়। এ কারণে আমরা অস্বস্তিবোধ করছি। বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের স্থলে নির্যাতিতদের পরিসংখ্যান গ্রহণ আমাদেরকে একটি সতর্ক সংকেত প্রদান করছে। এটি নিছক কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলন নয় বরং দেশ ও জাতিকে বিভক্ত করার হীন চক্রান্ত, যার ফলশ্রুতিতে দেশের শান্তিশৃংখলা সর্বোপরি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হবে।

আহমদ তৌফীক চৌধুরী বলেন, মৌলবাদীর ফতোয়ার জন্যে আজ নারী নেত্রীত্বকে বেছে নিয়েছে। অথচ তারাই বলেছিল নারী নেত্রীত্ব ইসলামসম্মত নয়। '৭৪ সালে পাকিস্তানে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার পর বহু লোককে হত্যা করা হয়েছিল, মসজিদ ভাঙ্গাসহ নির্যাতন চালানো হয়েছিল, এদেশেও এ উদ্দেশ্যে তারা তৎপরতা চালাচ্ছে"।

(১/৪/৯৪ইং তারিখের দৈনিক খবর পত্রিকার সৌজন্যে)

বিশেষ সাক্ষাতকারে কাদিয়ানী নেতা

"নিউজ এণ্ড ফিচার সার্ভিস : আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের জাতীয় আমীর মোহাম্মদ মোস্তফা আলী বলেছেন, পাকিস্তানী ধ্যান-ধারণা বাংলাদেশেও কাদিয়ানী ইস্যুকে নির্বাচনী ইস্যু তৈরীর চেষ্টা হচ্ছে। পাকিস্তানে টাউট বলে ঘোষিত মৌলভীরা এ ব্যাপারে এখানে প্রশিক্ষণ দিয়ে গেছেন। রাষ্ট্রপতি আমাদের কাছে জানতে চেয়েছেন সংখ্যা কত সারাদেশে। এ পরিস্থিতিতে আমরা অস্বস্তি বোধ করছি। বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে সরকার কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির ধর্ম ঠিক করে নিতে পারে না। কিন্তু সে ব্যাপারেই চেষ্টা হচ্ছে। আমাদের হত্যা করতে চায়। তারা লুট করতে চায় আমাদের ধন সম্পত্তি। মোহাম্মদ মোস্তফা আলী গতকাল বিকেলে নিউজ এণ্ড ফিচার সার্ভিসকে দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে কথাগুলো বলেন।

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী বলেন, আমরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। ১৯৯২ সালের ২৯শে অক্টোবর আমাদের মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছে। এরপর আমরা চেষ্টা করেও প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। এ ঘটনার পর সরকারের পক্ষ থেকে কোন বক্তব্যও দেয়া হয়নি। সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, ঘটনার জন্য ১০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু এ ১০ জনকে ওই বক্তব্যের পরই ছেড়ে দেয়া হয়। আমরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে এর কারণ জানতে চেয়েছিলাম। তিনি বলেছেন, এদের ছেড়ে না দিলে আরো ঘটনা ঘটবে। গত বছর ২৪শে ডিসেম্বর খতমে নবুওত নামের সংগঠন আমাদের অমুসলিম ঘোষণার দাবীতে মহাসম্মেলন ডাকার পর আমরা রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেছিলাম। রাষ্ট্রপতি জানুয়ারী ২২ তারিখে আমাদের এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেন। এরপর সেই এ্যাপয়েন্টমেন্ট পাল্টে ৬ ফেব্রুয়ারী নির্ধারণ করা হয়। রাষ্ট্রপতিকে আমরা আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার সম্পর্কে বলেছি। আমরা নিরাপত্তা চেয়েছিলাম তাঁর কাছে। রাষ্ট্রপতি আমাদের সংখ্যা জানতে চান। এরপর সরকারীভাবে সমস্ত থানায় নির্দেশনা পাঠানো হয়েছে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের পরিসংখ্যান জানতে চেয়ে। আমরা এরপর থেকে অস্বস্তি বোধ করছি। সিটি করপোরেশনের নির্বাচনের পর ঢাকায় সরকারী দলের প্রার্থী মির্জা আব্বাস দলীয় ফোরামে বলেছেন, তাকে কাদিয়ানী বলে অপপ্রচার চালানো হয়েছে। তার পরাজয়ের এটিও একটি কারণ বলেছেন তিনি। ঢাকায় ঈদের কেন্দ্রীয় জামাতে খতমে নবুওত-এর নেতা মাওলানা ওবায়দুল হক কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার প্রতিশ্রুতি চেয়েছেন। রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবৃন্দ, ঢাকার মেয়র ছিলেন ওই জামাতে। খতমে নবুওতের নেতারা পাকিস্তানী শিক্ষায় বিদেশী টাকায় সরকারকে অস্থিতিশীল করে স্বার্থসিদ্ধ করতে চায়। মোস্তফা আলী বলেন, আমরা কোন রাজনৈতিক সংগঠন নই। আল্লার কাছেই আমাদের আবেদন জানাতে চাই। আমাদের কেউ অমুসলমান ঘোষণা করলেও আমরা মুসলমান। হযরত মোহাম্মদ (সা:)

(অবশিষ্টাংশ ৩৪-এর পাতায় দেখুন)

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সংবাদ সম্মেলন

একটি সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠি দেশে দাঙ্গা বাঁধানোর অপচেষ্টা চালাচ্ছে

"কাগজ প্রতিবেদক: আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর মোহাম্মদ মোস্তফা আলী বলেছেন, কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে একটি সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠি দেশে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা বাঁধানোর অপচেষ্টা চালাচ্ছে। তিনি বলেন, কেউ আমাদের অমুসলমান ঘোষণা করলেও আমরা তা মেনে নেব না। কারণ কে মুসলমান আর মুসলমান না সেটা নির্ধারণ করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌র। কাদিয়ানী বিরোধী সাম্প্রতিক আন্দোলনের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি তুলে ধরার জন্যে আহমদীয়া জামাতের পক্ষ থেকে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে মোহাম্মদ মোস্তফা আলী এ কথা বলেন।

গত কয়েকদিন থেকে একটি বিশেষ মহল কর্তৃক বকশী বাজারস্থ আহমদীয়া মসজিদে লাগাতার বোমা হামলার তথ্য উল্লেখ করে মোস্তফা আলী, আহমদ তৌফিক চৌধুরী, মাওলানা আবদুল আউয়াল খান প্রমুখ নেতা বলেন, আমরা বহুমুখি ষড়যন্ত্রের আভাস পাচ্ছি। মিথ্যা কেসে আমাদের নাম জড়ানো হতে পারে, কোনো ব্যক্তিকে মেরে হয়তো রটিয়ে দেবে আমরা মেরেছি।

আহমদীয়া নেতাদের ভাষায় পাকিস্তানেও এসব কায়দায়ই কাদিয়ানীদের হয়রানি করা হয়েছে।

খতমে নবুয়তের ব্যানারে মনজুর চিনটি, আল্লা ওসায়া প্রমুখ যেসব পাকিস্তানী ব্যক্তি বাংলাদেশে এসে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের উস্কানি দিচ্ছে তাদের অতীত কীর্তিকলাপ তুলে ধরে সংবাদ সম্মেলনে জনগণকে এসব 'রাজনৈতিক মাওলানা'দের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হয়।

সরকার কর্তৃক কাদিয়ানীদের পরিসংখান সংগ্রহের উদ্যোগ সম্পর্কে নেতারা বলেন, বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের পরিসংখান নেয়াই বেশি জরুরি"।

(১/৪/৯৪ তারিখের দৈনিক আজকের কাগজের সৌজন্যে)

(৩৩ পাতার পর)

এর উম্মত থাকবো। দেশের আইনের প্রটেকশন চাই আমরা। কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে প্রচারণা সম্পর্কে কোন বাহাসে বসতে রাজী আছেন কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমরা বাহাসের বিরোধী নই। বাহাস সংবাদপত্রের মাধ্যমে হলে ভাল হয়। এমনিতে বাহাসে বিচারক থাকবেন কে, কারা? তাদের মানদণ্ডই বা কি। এরচেয়ে সংবাদপত্রের মাধ্যমে বাহাস হলে তা যথাযথ হতে পারে"।

(১/৪/৯৪ইং তারিখের দৈনিক খবর পত্রিকার সৌজন্যে)

খতমে নবুওয়ত মৌলবাদী শক্তি ঃ আহমদীয়া জামাত

"ষ্টাফ রিপোর্টার: আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের জাতীয় আমীর মোহাম্মদ মোস্তফা আলী তথাকথিত কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলনকে পাকিস্তানী ভাবধারায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে জাতিকে বিভক্ত এবং দেশের শান্তি-শৃঙখলা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের একটি চক্রান্ত বলে অভিহিত করেছেন।

তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, তথাকথিত কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে দেশে এক রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা বাঁধানোর অপচেষ্টা চলছে। যেমন ১৯৫৩ সালে পাকিস্তানে এরূপ অঘটনই ঘটানো হয়েছিল।

বৃহস্পতিবার বিকালে বকশী বাজারে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি প্রাণনাশের হুমকি থেকে আহমদীয়া নেতৃবৃন্দের জানমাল রক্ষার জন্য সরকার ও দেশবাসীর প্রতি আবেদন জানান। এতে জামাতের নায়েবে আমীর আহমদ তওফিক চৌধুরী ও কেন্দ্রীয় প্রচারক আবদুল আওয়াল খান চৌধুরী বক্তব্য রাখেন।

আমীর মোহাম্মদ মোস্তফা আলী "মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুওয়ত"কে প্রতিক্রিয়াশীল মৌলবাদী শক্তি বলে আখ্যায়িত করে বলেন, ইদানীং বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত কয়েকটি নির্বাচনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এদেশে ধর্মান্ধ ও ধর্ম ব্যবসায়ী মৌলবাদীদের স্থান দ্রুত সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। তাই তারা নতুন চালে আহমদীয়া মুসলিম বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান টিকিয়ে রাখার চেষ্টা চালাচ্ছে। পবিত্র ধর্মের দোহাই দিয়ে তারা যে ক্ষমতাবাজ তা প্রমাণ করতে চায়। তারা ইসলাম রক্ষার জিকির তুলে বাংলাদেশের সংবিধানে সংশোধনী আনতে চায়।

গত ডিসেম্বর জানুয়ারীতে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ সফরকারী খতমে নবুওয়তের নেতা আল্লাহ ওয়াসায়া ওরফে টিক্কি খাদ্দু ও মোহাম্মদ খান লেঘারির কথা উল্লেখ করে তিনি জানান, ১৯৮৫ সালে পাকিস্তানের দেরা গাজী খানের আদালতে তাদেরকে 'টাউট' বলে রায় দেয়া হয় এবং সকল সরকারী অফিসে তাদের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এ সম্পর্কে করাচীর "ডনে" প্রকাশিত প্রতিবেদনের তিনি উদ্ধৃতি দেন। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের নেতা দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, অথচ সেই টাউট ঘোষিত মৌলবীরা বাংলাদেশের রাজধানীতে আসার সরকারী অনুমতি পায়।

এক প্রশ্নের জবাবে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের আমীর বলেন, কলেমায় বিশ্বাসী কোন মুসলমান নাগরিককে "কাফের" অথবা "অমুসলিম" ঘোষণার অধিকার আল্লাহ কাউকে দেননি। তাছাড়া পবিত্র ইসলামের নামে কেউ কোন সমাবেশ-মিছিলে "জবাই কর" শ্লোগান দিতে পারে না। এমন কি, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী কোন মানুষকে "জবাই" করার প্রকাশ্য ঘোষণা দেয়াও সম্পূর্ণভাবে মানবতা বিরোধী"।

(১-৪-৪৯ইং তারিখের দৈনিক বাংলার সৌজন্যে)

কাদিয়ানী ইস্যুকে নির্বাচনী ইস্যু করার চেষ্টা চলছে

সাক্ষাৎকারে আমীর মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

নিউজ এণ্ড ফিচার সার্ভিস :—

"আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের জাতীয় আমীর মোহাম্মদ মোস্তফা আলী বলেছেন পাকিস্তানী ধ্যান ধারণা বাংলাদেশেও কাদিয়ানী ইস্যুকে নির্বাচনী ইস্যু তৈরির চেষ্টা হচ্ছে। পাকিস্তানে টাউট বলে ঘোষিত মৌলভীরা এ ব্যাপারে এখানে প্রশিক্ষণ দিয়ে গেছেন। রাষ্ট্রপতি আমাদের কাছে জানতে চেয়েছেন সারাদেশে আমাদের সংখ্যা কত। এই পরিস্থিতিতে আমরা অস্বস্তি বোধ করছি। বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে সরকার কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ধর্ম ঠিক করে দিতে পারেন না। কিন্তু সে ব্যাপারে চেষ্টা হচ্ছে। আমাদের হত্যা করতে চায়। তারা লুট করতে চায় আমাদের ধনসম্পত্তি। মোহাম্মদ মোস্তফা আলী গতকাল বিকেলে নিউজ এণ্ড ফিচার সার্ভিসকে দেয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে কথাগুলো বলেন।

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী বলেন, আমরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। ১৯৯২ সালের ২৯ অক্টোবর আমাদের মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছে। এরপর আমরা চেষ্টা করেও প্রধান-মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে পারি নি। এই ঘটনার পর সরকারের পক্ষ থেকে কোন বক্তব্যও দেয়া হয়নি। সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, ঘটনার জন্যে ১০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু এই ১০ জনকে ওই বক্তব্যের পরেই ছেড়ে দেয়া হয়। আমরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে এর কারণ জানতে চেয়েছিলাম। তিনি বলেছেন, এদের ছেড়ে না দিলে আরো ঘটনা ঘটবে। গত বছর ২৪ ডিসেম্বর খতমে নবুওয়ত নামের সংগঠন আমাদের অমুসলিম ঘোষণার দাবীতে মহাসম্মেলন ডাকার পর আমরা রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করে-ছিলাম। রাষ্ট্রপতি জানুয়ারীর ২২ তারিখে আমাদের এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেন। এর পর সেই এ্যাপয়েন্টমেন্ট পাল্টে ৬ ফেব্রুয়ারি নির্ধারণ করা হয়। রাষ্ট্রপতিকে আমরা আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার সম্পর্কে বলেছি। আমরা নিরাপত্তা চেয়েছি তাঁর কাছে। রাষ্ট্রপতি আমাদের সংখ্যা জানতে চান। এরপর সরকারিভাবে সমস্ত থানায় নির্দেশনামা পাঠানো হয়েছে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের পরিসংখ্যান জানতে চেয়ে। আমরা এরপর থেকে অস্বস্তি ভোগ করছি। সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনের পর ঢাকায় সরকারি দলের প্রার্থী মির্যা আব্বাস দলীয় ফোরামে বলেছেন, তাকে কাদিয়ানী বলে অপপ্রচার চালানো হয়েছে।

(অবশিষ্টাংশ ৩৮ পাতায় দেখুন)

কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করা অসাংবিধানিক

—আহমদীয়া মুসলিম জামাত

"ষ্টাফ রিপোর্টার ।। আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ নেতৃবৃন্দ বলেছেন, কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করা অসাংবিধানিক। পাকিস্তান থেকে আমদানী করা কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলন দেশ ও জাতিকে বিভক্ত করার চক্রান্তই শুধু নয়, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিও বিনষ্ট করবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বকশীবাজার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ একথা বলেন। লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন মাওলানা আব্দুল (আওয়াল) খান চৌধুরী, এসময় উপস্থিত ছিলেন নায়েবে আমীর আহমেদ তৌফিক চৌধুরী, জাতীয় আমীর মোস্তফা আলী, নায়েবে আমীর মকবুল আহমেদ খান, এটি এম হক, আলহাজ্ব তোবারক আলী। সংবাদ সম্মেলন চলাকালে বাইরে রাস্তায় একটি পটকা বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া যায়।

তৌফিক আহমেদ চৌধুরী প্রশ্ন করে বলেন, কোন ধর্ম কি হত্যা সমর্থন করে? অথচ এক শ্রেণীর ধর্ম ব্যবসায়ীরা কাদিয়ানীদের হত্যা, মসজিদ-মাদ্রাসা ভাঙ্গা, কোরআন শরীফ পুড়ে ফেলার অপচেষ্টায় লিপ্ত। পাকিস্তানে কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলনের নামে হত্যা মসজিদ ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। ধর্ম ব্যবসায়ীরা পাকিস্তানে আইন করে শতাধিক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। ১২/১৩টি মসজিদকে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে এবং ৯টি মসজিদে তালা দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করার কারো অধিকার নেই। কেউ হয়ত বলতে পারে আমরা অমুসলিম। কিন্তু পাশাপাশি আমাদের ধর্ম পালনে কেউ বাধা দিতে পারে না।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, দেশে ধর্মান্ধ ও ধর্ম ব্যবসায়ী মৌলবাদীদের অবস্থান সংকুচিত হওয়ায় তারা নতুন চালে আহমদীয়া বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। একটি মৌলবাদী চক্র অবৈধভাবে পাকিস্তান থেকে অস্ত্র আমদানী করে। তারা কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে দেশে এক রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা বাধানোর অপচেষ্টা চালাচ্ছে। ১৯৫৩ সালে পাকিস্তানে এরূপ অঘটন ঘটানো হয়েছিল। যে কোন অপশক্তিই এদেশে ধর্মের দোহাই দিয়ে যেন রক্তগঙ্গা বইয়ে দিতে না পারে সেজন্য দেশবাসীকে সাবধান হতে হবে।

লিখিত বক্তব্যে পাকিস্তানের বিভিন্ন পত্রিকার কাটিং তুলে ধরে বলা হয়, খতমে নবুওয়তের ছদ্মাবরণে এই অপশক্তি পাকিস্তানে প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা দিয়েছিল—আমাদের

প্রাণপ্রিয় খলিফা হযরত মির্জা তাহের আহমদ নাকি আসলাম কোরেশী নামক জনৈক মৌলানাকে অপহরণ করে হত্যা করেছেন। দীর্ঘ ৫ বছর তাদের এ অপপ্রচারের দরুন আহমদীদের ওপর অনেক জুলুম অত্যাচার হয়। অবশেষে মৌলানা আসলাম কোরাইশী সকল অপপ্রচার মিথ্যা সাব্যস্ত করে ১৯৮৮ সালে ইরান থেকে সজ্ঞানে ফিরে আসে। পাকিস্তানী পন্থায় তারা ঢাকায় একটি খতমে নবুওয়ত প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে। টাকার নোটের ওপর 'কাদিয়ানীরা কাফের' সীল মেরে বাজারে ছাড়া হয়েছে। যা সরকারী নীতি বিরুদ্ধ।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, ধর্ম ব্যবসায়ীরা ইসলাম রক্ষার জিকির তুলে সংবিধানে সংশোধনী আনার চেষ্টায় লিপ্ত, তারা ধর্ম রক্ষার অজুহাতে শান্তিপূর্ণ সমাজে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়িয়ে স্বার্থসিদ্ধি করতে উদ্যত। কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে কার্যকলাপ তুঙ্গে যাবার পর শিয়া, ওহাবী, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে অন্দোলন হওয়া বিচিত্র কিছু নয়।

নেতৃবৃন্দ সংবাদ সম্মেলনে বলেন, জানমালের নিরাপত্তার জন্য ৬ ফেব্রুয়ারি '৯৪ তারিখে ৭ জন নেতা রাষ্ট্রপতির সাথে দেখা করার আবেদন করেছি"।

(১/৪/৯৪ইং তারিখের দৈনিক আল আমীন-এর সৌজন্যে)

(৩৬ পাতার পর)

পরাজয়ের এটিও একটি কারণ বলে তিনি বলেছেন। ঢাকায় ঈদের কেন্দ্রীয় জামাতে খতমে নবুওয়ত-এর নেতা মাওলানা ওবায়দুল হক কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার প্রতিশ্রুতি চেয়েছেন। রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ, ঢাকার মেয়র ছিলেন ওই জামাতে। খতমে নবুওয়তের নেতারা পাকিস্তানী শিক্ষায়, বিদেশী টাকায় সরকারকে অস্থিতিশীল করে স্বার্থসিদ্ধি করতে চায়। মোস্তফা আলী বলেন, আমরা কোন রাজনৈতিক সংগঠন নই আল্লাহর কাছেই আমাদের আবেদন জানাতে চাই। আমাদের কেউ অমুসলিম ঘোষণা করলেও আমরা মুসলমান, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মত থাকবো। দেশের আইনের প্রটেকশন চাই আমরা। কাদিয়ানীদেয় বিরুদ্ধে প্রচারণা সম্পর্কে কোন বাহাসে বসতে রাজি আছেন কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন—আমরা বাহাসের বিরোধী নই। বাহাস সংবাদপত্রের মাধ্যমে হলে ভালো হয়। এমনিতে বাহাসে বিচারক থাকবে কে, কারা? তাদের মানদণ্ডই বা কি। এর চেয়ে সংবাদপত্রের মাধ্যমে বাহাস হলে তা যথাযথ হতে পারে"।

(১-৪-৯৪ তারিখের দৈনিক লাল সবুজের সৌজন্যে)

কোঁপল (নতুন কুঁড়ি)

(৫ থেকে ৭ বছরের শিশুর জন্যে তা'লীম তরবিয়তী পাঠ্যসূচী)

১৬ ও ১৭শ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

অনুবাদ—মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

১৬। মা : সূরা ইখলাসও মুখস্ত করিয়েছিলাম যা 'কুল' দিয়ে শুরু হয়।

শিশু : প্রথমে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম।'

১৭। মা : সাবাস, এখন 'কুল' থেকে বলতো আব্বু।

শিশু : কুল্ হুয়াল্লাহু আহাদ আল্লাহুস্ সামাদ লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়া কুল্লাহু কুফুয়ান আহাদ।

১৮। মা : বেশ, এখন বল, কোন ব্যক্তি নামায পড়ছেন তার সামনে দিয়ে যাওয়া উচিত কি উচিত নয়।

শিশু : অবশ্যই যাওয়া উচিত নয়।

আহাদীস [রসূলে করীম (সাঃ)-এর কথা]

১। মা : আমাদের প্রিয় নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের কথাকে হাদীস বলে। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের কথাকে কি বলে?

শিশু : হাদীস

২। মা : হাদীস মুখস্ত করলে আল্লাহ্তা'লা অনেক খুশী হন কেননা ইহা এমন কথা যা আমাদের প্রিয় নেতার মুখ থেকে বের হয়েছে। আম্মার সাথে পুনরাবৃত্তি করো—আদ্দীনুন্নাসীহাতু।

শিশু : আদ্দীনুন্নাসীহাতু।

৩। মা : এর অর্থও আমার সাথে সাথে পাঠ করো ধর্মের আর এক নাম কল্যাণ সাধন।

শিশু : ধর্মের আর এক নাম কল্যাণ সাধন।

৪। মা : তুমি বলতো—আতে' আবাকা।

শিশু : আতে' আবাকা।

৫। মা : এর অর্থ এই যে, তোমার পিতার কথা মান্য করো। এখন বলো—আল্ খালাতু ওয়ালেদাতুন।

শিশু : আল্ খালাতু ওয়ালেদাতুন।

৬। মা : এর অর্থ হলো—খালাও মায়ের মতই।

শিক্ষণীয় বাক্য

১। মা : যখনই কোন কাজ করো।
শিশু : 'বিসমিল্লাহ্' পড়ে নাও।
২। মা : আল্লাহ্ আল্লাহ্ করতে থাকো।
শিশু : নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এর নামও নাও।
৩। মা : পাখী চিঁ চিঁ করে ডাকে।
শিশু : খুকী কায়দা পড়ে।
৪। মা : কাক 'কা' 'কা' করে ডাকে
শিশু : খোকা কায়দা পড়ে।
৫। মা : এখন গণনা শিখার নযম শিখানো হবে।
শিশু : এক, দুই, তিন।
৬। মা : আস শিখি দীন (ধর্ম)
শিশু : চার, পাঁচ, ছয়।
৭। মা : প্রভু থেকে পায়।
শিশু : সাত, আট, নয়, দশ।
৮। মা : যে বলে সে করুক শেষ।
শিশু : যে বলে সে করুক শেষ।
৯। মা : আমাদের খোদা।
শিশু : জীবন্ত খোদা।
১০। মা : আমাদের রসূল।
শিশু : জীবন্ত রসূল।
১১। মা : একে একে হয় দুই।
শিশু : মারা মারি ঝগড়া ঝাটি করতে নেই।
১২। মা : চার হতে লাগে দুই আর দুই।
শিশু : যা খাও নিজে পরকে দাও তাই।
১৩। মা : চারে চারে আট হয়।
শিশু : সবে মিলে খেলতে হয়।
১৪। মা : আট আর আটে হয় ষোল।
শিশু : খোকন রাজা বর সেজেছে ভালো।

দোয়াসমূহ

১। মা : জ্ঞান বৃদ্ধির জন্যে দোয়াটি শুনাও তো আব্বু।
শিশু : রাব্বি যদনী ইলমান
২। মা : এর অর্থ বল তো।
শিশু : হে আমার প্রভু! আমাকে জ্ঞানে বৃদ্ধি করে দিন।
৩। মা : 'ইয়া হাফিযু' সম্পর্কিত ছোট দোয়াটি বল।
শিশু : ইয়্যা হাফিযু ইয়্যা আযীযু ইয়্যা রাফিকু।
৪। মা : হে রক্ষা কর্তা, হে পরাক্রমশালী, হে বন্ধু! আমার শিশুকে পুণ্যবান করো। (চলবে)

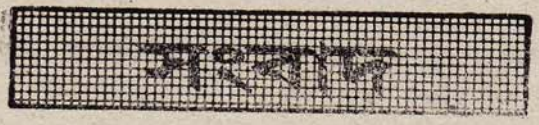

সংবাদ

০ মোহতরম জনাব ভিজির আলী সাহেবের অকাল মৃত্যুতে হুযূর আকদস (আইঃ) এর অনুমোদনক্রমে খাকসারকে সেক্রেটারী ওয়াকফে নও, বাংলাদেশ এর দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়েছে। তৎসঙ্গে আরও ৪জন সহকারী সেক্রেটারী ওয়াকফে নও এর নিযুক্তি প্রদান করা হয়েছে।

তাহরীকে ওয়াকফে নও এর চার বছরের সময়সীমা ৩-৪-৯১ তারিখে শেষ হয়েছিল। ইতিমধ্যে হুযূর (আইঃ) নতুন পর্যায়ে সন্তানদের ওয়াকফে নওতে শামিল করার অনুমতি দিয়েছেন। ওয়াকফে নও এর বর্তমান সংখ্যা এগারো হাজারের উর্দ্ধে আছে আর তা থেকে পনর হাজারে পৌঁছানোর অনুমতি দিয়েছেন হুযূর (আইঃ), আলহামদুলিল্লাহ।

মোহাম্মদ শামসুর রহমান

০ আগামী ১৯ হতে ২৬শে আগষ্ট '৯৪ আট দিন ব্যাপী কেন্দ্রীয় বার্ষিক তালীম তরবীয়তি ক্লাস '৯৪ অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ ব্যাপারে জনাব মোহাম্মদ আবদুস সামী, নায়েব সদর—১কে চেয়ারম্যান ও খাকসারকে সেক্রেটারী করে ১১সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলকে এ ব্যাপারে প্রস্তুতি গ্রহণ ও উক্ত কমিটিকে তালীম ও তরবীয়তি ক্লাস সম্পর্কে গঠনমূলক প্রস্তাব ও পরামর্শ প্রদান করে এর প্রোগ্রাম ও সিলেবাস প্রণয়নে সহযোগিতা প্রদান এবং এর সাফল্যের জন্য দোয়া করার অনুরোধ করা যাচ্ছে। স্থানীয় কায়েদগণকে ক্লাসে প্রেরিতব্য তালীম তরবিয়তী ক্লাসের নির্বাচিত কৃতি খোদ্দাম ও আতফালের নামের তালিকা জুন '৯৪ এর মধ্যে অত্র অফিসে পাঠানোর নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে। এই তালিকা বহির্ভূত কাউকে বিশেষ অনুমতি ব্যতীত ক্লাসে যোগদান করতে দেয়া হবে না।

মুহাম্মদ সেলিম খান
মোতামাদ, মজলিসে খোঃ আঃ বাঃ

০ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে ৪ঠা মার্চ '৯৪ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুয়া উত্তর আহমদী পাড়া নামাযের স্থানে 'শান্তির জন্য শিক্ষা' এই স্লোগানের উপর ভিত্তি করে একটি সেমিনার অত্যন্ত সুন্দর ও সাফল্যজনকভাবে অনুষ্ঠিত হয়, আল্ হামদুলিল্লাহ।

০ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার সহযোগিতায় গত ২৬/৩/৯৪ইং রোজ শনিবার বিকাল ৪ ঘটিকায় এক তবলীগি সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

০ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া ঘাটুরা কর্তৃক গত ৪ঠা মার্চ হতে ১১ই মার্চ (৮ দিন) পর্যন্ত ৩য় বার্ষিক তালীম ও তরবিয়তী ক্লাস '৯৪ আহমদীয়া মসজিদ ঘাটুরায় অনুষ্ঠিত হয়।

০ ঘাটুরা মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে গত ২৪/৩/৯৪ইং রোজ বৃহস্পতিবার মাগরিব নামাযের পর খেদমতে খালক দিবস পালন করা হয়।

০ গত ২৫ ফেব্রুয়ারী বাদ জুমুআ চট্টগ্রাম মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে 'রমযানের তাৎপর্য' শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

০ গত ২৫শে মার্চ ১৯৯৪ইং অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সহিত মজলিস আতফালুল আহমদীয়া কুমিল্লার উদ্যোগে "মাতাপিতা দিবস" পালন করা হয়।

০ গত ৭ই মার্চ ১৯৯৪ইং তারিখে আহমদীয়া মুঃ জাঃ হোসনাবাদের উদ্যোগে এক বিশেষ তবলীগি সেমিনার ও ইফতারী '৯৪ এর আয়োজন করা হয়।

০ আতফালুল আহমদীয়া কুমিল্লার উদ্যোগে গত ২৪/২/৯৩ইং কুমিল্লার কয়েকটি ব্যাংক, ক্যান্টনমেন্ট, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কয়েকটি বড় বড় দোকান এলাকায় এক তবলীগের অভিযান চালানো হয়।

০ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ১০ই রমযান থেকে ৭ দিন ব্যাপী স্থানীয় বার্ষিক তালীম তরবীয়তী ক্লাস ও ১ দিনের ইজতেমা অত্যন্ত সুন্দর ও সাফল্যজনকভাবে সম্পন্ন করিয়াছে, আলহামদুলিল্লাহ্।

০ আল্লাহতা'লার ফযলে গত ৪/৩/৯৪ইং হইতে ১০/৩/৯৪ইং পর্যন্ত সাত দিন ব্যাপী বরিশাল রি,জওনের ১ম বার্ষিক তালীম তরবীয়তি ক্লাস আঃ মুসলিম জামাত কুকুয়াতে অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছে, আলহামদুলিল্লাহ্।

০ গত ১৬ হইতে ২০শে রমযান তারুয়া জামা'তে ৫ দিন ব্যাপী স্থানীয়ভাবে তালীম তরবিয়তী ক্লাশ ও ইজতেমা সুসম্পন্ন হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

০ আল্লাহ্তা'লার অশেষ ফযল ও বরকতে সুন্দরবন মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া আয়োজিত ১৫-১-৯৪ইং তারিখে রোজ শনিবার সারাদিন ব্যাপী যথাযোগ্য মর্যাদায় আতফাল দিবস পালিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

০ আল্লাহ্তা'লার অশেষ ফযলে গত ২৪/১২/৯৩ তারিখে রোজ শুক্রবার জামালপুর ও চান্দপুর চা-বাগান মজলিসে আতফালুল আহমদীয়ার যৌথ উদ্যোগে ১ম বার্ষিক আতফাল দিবস পালন করা হয়।

০ খুলনা মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে গত ১২/২/৯৪, ১৬/২/৯৪ এবং ১৯/২/৯৪ তারিখে ব্যাপক ওয়াকারে আমল কর্মসূচী পালন করা হয়।

০ এ পর্যন্ত পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে যে, নিম্নোক্ত জামা'ত অতি শান ও শওকতের সাথে ২৩শে মার্চ মসীহ মাওউদ (আঃ) দিবস পালন করেছে—

কুমিল্লা, ক্রোড়া, ঘাটুরা, খুলনা, তারুয়া, চুয়াডাঙ্গা, বিষ্ণুপুর, সুন্দরবন, তাহেরাবাদ, বি, বাড়িয়া, তেবাড়িয়া, নাসেরাবাদ, কটিয়াদি, বীরগাঁও, ঢাকা ও ডোহাণ্ডা।

শুভ বিবাহ

গত ২৮-২-৯৪ তারিখে আল্লাহ্র ফযলে জনাব মোহাম্মদ আবুল হোসেন ভূঁইয়া, পিতা জনাব মোহাম্মদ আলী আকবর ভূঁইয়া, গ্রাম : তালুকপাড়া, পোঃ বাতাইছড়ি, জিলা কুমিল্লা এর বিয়ে অনুষ্ঠিত হয় মোসাম্মাৎ খাদিজা সুলতানা (হীরা), পিতা মোহাম্মদ আবু তাহের, পূর্ব মোড়াইল কলেজ পাড়া, বি, বাড়ীয়া-এর সাথে ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা মোহরানা ধার্যে আহমদীয়া মুসলিম জামাত বি, বাড়ীয়াতে সুসম্পন্ন হয়। বিয়ে পড়ান মৌলানা ফিরোজ আলম সাহেব, সদর মুরব্বী আঃ মুঃ জাঃ বাংলাদেশ। উক্ত বিয়ে যাতে বরকতময় এবং দাম্পত্য জীবন সুখ শান্তিপূর্ণ ও কল্যাণময় হয় তার জন্য জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট খাস দোয়ার দরখাস্ত করছি।

মোহাম্মদ খালেদ মোশারফ (ফরহাদ)
কুমিল্লা

আসহাবে কাহাফের পাতা—আররকীম

চান্দ্র ও সৌর বর্ষ

চন্দ্র, সূর্য এবং কখনো কখনো তারকার সাহায্যে সুদূর অতীত থেকে বর্ষ গণনা হয়ে আসছে।

অনেকের ধারণা চান্দ্র বৎসর ইসলামি এবং সৌর বৎসর অইসলামি। কিন্তু এটি সম্পূর্ণ রূপে ভ্রান্ত ধারণা। পবিত্র কুরআনে আছে—হুয়াল্লাযি জায়ালাশ্ শামসা যিয়াআও ওয়াল কামারা নুরাও কাদ্দারাহু মানাযিলা লি তালামু আদাদাস সিনিন ওয়াল হিসাবা—অর্থাৎ আল্লাহ্ সূর্য ও চন্দ্রের গতিপথ নির্ধারিত করে দিয়েছেন যাতে আমরা সেইগুলিকে অবলম্বন করে বৎসর গণনা করতে পারি (সূরা ইউনুস)। এখানে সৌর এবং চান্দ্র এই উভয় প্রকার হিসাবকেই ইসলাম সমভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। অতএব চান্দ্র মাস ইসলামি এবং সৌর মাস ইসলামি নয় এ ধারণাটি সম্পূর্ণ বাতিল। চন্দ্র সূর্যের ঝগড়া শুধু বৎসর গণনায়ই সীমাবদ্ধ থাকে নি। এর বিস্তৃতি ঘটেছে অন্যত্রও। কোন পতাকায় চাঁদ তারা থাকলেই সেটা ইসলামি পতাকা হয়; অপর দিকে সূর্য খচিত পতাকা দেখলেই সেটা অইসলামি ভাবধারা পুষ্ট বলেও অনেকে মনে করেন। তাদের ধারণা সূর্যকে হিন্দুরা দেবতা জ্ঞান করে সূর্যের পূজা করে অতএব এটি হিন্দুয়ানী ব্যাপার। এই ধারণাও অজ্ঞতা প্রসূত। চন্দ্র এবং সূর্য উভয়েই আল্লাহ্র সৃষ্ট। সূর্যের হিসাবে ইসলামের বহু ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালিত হয়ে থাকে। নামায বলুন, রোযা বলুন এসবই সূর্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সূর্য অস্ত না গেলে ইফতার করা যায় না। সূর্য উদয়ের পুর্ব পর্যন্ত ফজর, সূর্য হেলে গেলে যোহর, সূর্য হেলে গিয়ে ছায়া যখন দ্বিগুণ হয় তখন আসর, সূর্যাস্তের পরক্ষণেই মাগরিব এবং সূর্যের আভা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্তির পর পরই এশার নামাযের ওয়াক্ত হয়ে থাকে। অতএব সূর্যের প্রতি কোন প্রকার এলার্জি থাকা কোন প্রকৃত মুসলমানের পক্ষে কোন ক্রমেই যুক্তি যুক্ত নয়। ইসলাম চাঁদের হিসাবে যেমন, হজ্জ, রমযান ইত্যাদির সময় নিধারণ করে তেমনি দৈনান্দন অনুষ্ঠানাদির জন্য সূর্যকে ব্যবহার করে। চন্দ্র ও সূর্য এই উভয় বস্তুই মুসলমানের সেবক। অপর দিকে হিন্দুদের মধ্যেও চাঁদের প্রতি একটা ভিন্ন মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। চাঁদ তারা খচিত কোন চিহ্ন দেখলেই তারা সেটিকে বিজাতীয় মনে করে থাকেন। অথচ শিবের কপালে তারা চাঁদ এঁকে রেখেছেন। মৃত ব্যাক্তির নামের আগে চন্দ্রবন্দু ব্যবহার করেন। চন্দ্রবিন্দু দ্বারা স্বর্গীয় বোঝানো হয়ে থাকে অতএব চাঁদ হল স্বর্গীয় প্রতীক। বিভিন্ন পূজা পার্বণের সময়ও তারা চাঁদ দ্বারা নির্ধারিত করে থাকেন। ষষ্ঠি, সপ্তমী, অষ্টমী, দশমী, বা একাদশী এসবই চাঁদের হিসাব।

তবে মুসলমানদের হিসাবের সঙ্গে এই হিসাবে একদিনের গরমিল রয়েছে। প্রথম চন্দ্র দর্শনের পরবর্তী রাত্র থেকে মুসলমানরা চান্দ্রমাস গণনা করে থাকেন, অপর দিকে হিন্দুরা প্রতিপদ থেকে মাস গণনা শুরু করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, মাস শব্দের অর্থও চাঁদ। সংস্কৃতে চাঁদের অপর নাম মাসকৃৎ। বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরাও তাদের ধর্ম কর্ম চাঁদের হিসাবেই করে থাকেন। বৈশাখী পুর্ণিমা, মাঘী পুর্ণিমা, এ সবই চাঁদের হিসাবে। ঋগ্বেদে আছে—বেদা-মাসো ধৃতব্রতো দ্বাদশ প্রজাবৃতঃ বেদায় উপজায়তে (১/২৫/৮) অর্থাৎ সৌর হিসাবে দ্বাদশ মাসে বর্ষ গণনা করলে যা হবে চাঁদের হিসাবে বর্ষ গণনা করলে প্রতি তিন বৎসরে একটি অতিরিক্ত মাস বেরিয়ে আসবে। যাকে শাস্ত্রে মলিম্লুচ বা মলমাস বলা হয়েছে। হিন্দুদের কাছে এই মাসটি একটি অপবিত্র মাস। এমাসে কোন পূজা পার্বণ অনুষ্ঠিত হয় না। বিশুদ্ধ পঞ্জিকা মতে বছর খানেক আগেও এ নিয়ে বিতণ্ডার ঝড় উঠেছিল। তাই কেউ দুর্গাপূজা করেছিলেন শরতে আবার কেউ হেমন্তে। সৌর বৎসর এবং চান্দ্র বৎসরের মধ্যে প্রতি বৎসর দশ থেকে এগার দিনের পার্থক্য হয়ে থাকে। আর এরই ফলে প্রতি তিন বৎসর অন্তর একটি নতুন মাসের আবির্ভাব ঘটে। গড়ে চান্দ্রমাস সাড়ে উনত্রিশ দিনে হয়। চান্দ্র বৎসর তিনশত চুয়ান্ন দিন নয় ঘন্টা এবং সৌর বৎসর তিনশ' পঁয়ষট্টী দিন ছয় ঘন্টায় হয়ে থাকে। পণ্ডিতেরা বলে থাকেন মিশর অথবা বেবিলনবাসীরা নক্ষত্রের হিসাবে সর্ব প্রথম বর্ষ গণনা শুরু করেছিল। কিন্তু সেটা সর্বসাধারণের পক্ষে অনুসরণ এবং নির্ধারণ করা সম্ভব নয় বলেই তারকা থেকে বৃহদাকার (অন্ততঃ চর্ম চক্ষে) সূর্য ও চন্দ্রের সাহায্যে সহজ রীতি প্রবর্তিত হয়। নক্ষত্রের হেরফের দর্শন করা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়, জ্যোতিষ শাস্ত্র বিশারদরাই কেহ এনিয়ে মাথা ঘামাতে পারেন। নক্ষত্রের হিসাবে তিনশ' ষাট দিনে বৎসর হয়ে থাকে। বিভিন্ন তারকার অবস্থানকে কেন্দ্র করে নক্ষত্র বৎসর আবর্তিত হয়। তারকাগুলি ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রমতে, অশ্বিনী ভরনী, কৃত্তিকা, রোহিনী, মৃগশিরা, আদ্রা, পুনর্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্বফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া. শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভীষা, পূর্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ এবং রেবতী। এই তারকাগুলির সোয়া দুই পাদ নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে এক একটি মাস। যেমন অশ্বিনী থেকে আশ্বিন, কৃত্তিকা থেকে কার্ত্তিক, পুষ্যা থেকে পৌষ, মঘা থেকে মাঘ, ফল্গুনী থেকে ফাল্গুন, চিত্রা থেকে চৈত্র, বিশাখা থেকে বৈশাখ, জ্যেষ্ঠা থেকে জৈষ্ঠ্য, আষাঢ়া থেকে আষাঢ়, শ্রবণা থেকে শ্রাবণ, ভাদ্রপদ থেকে ভাদ্র মাসের নামকরণ করা হয়েছে। অনুরূপ মৃগশিরা থেকে হয়েছে মার্গশীর্ষ মাস। পরবর্তী কালে এই মাসের নাম হয় অগ্রহায়ণ। পৃথিবীর সর্বত্র সুদূর অতীত থেকে বারটি মাসই গণিত হয়ে আসছে। পবিত্র কুরআন বলে—ইন্না ইদ্দাতাশ্ শুহুরে ইন্দাল্লাহিসনা আশারা শাহরান ফি কিতাবিল্লাহে ইয়াওমা খালকাস সামাওয়াতে ওয়াল আরদ্—অর্থাৎ

আল্লাহ্‌র কাছে সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে দ্বাদশ মাসই মনোনীত হয়ে আছে (সূরা তওবা)। নানা দেশের নানা ভাষায় নানাভাবে নানা নামে এই দ্বাদশ মাস চালু আছে। ভগবত ধর্মের প্রাচীন ইতিহাসে বলা হয়েছে, 'প্রতিমাসে সূর্যকে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করার প্রথা এদেশে প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। তাহাতে এক বৎসর বা বারমাসে সূর্যের বার নাম হয় (১ম খণ্ড ৪০৫ পৃষ্ঠা, ডাঃ বিভুতি ভুষণ দত্ত কৃত)। হিন্দুরা যে বার আদিত্য দেবতার পূজা করে সেগুলিও প্রকৃত পক্ষে সূর্য অর্থাৎ বার মাসের বার নাম। গোলার্ধে সূর্যের অনুপস্থিতির কালকে বলে রাত্রি। আর রাত্রিও ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১২৭ সুক্তে দেবীরূপে বর্ণিত হয়েছে। হিন্দুদের অধিকাংশ দেবদেবীই এমনিভাবে প্রকৃতির কোন না কোন অংশের নাম। সূর্য যেমন দেবতা রাত্রিও তেমনি এক দেবী। হিন্দুশাস্ত্রে সূর্যের জননীর নাম উষা। উষার আগমনের পরই সূর্যের আগমন। আবার এই উষাকেই সূর্যের স্ত্রীরূপেও উল্লেখ করা হয়েছে। তাই হিন্দু পণ্ডিতদের মতে সূর্য অজাচারী দেবতা (দেব লোকের যৌবন জীবন, ডঃ অতুল সুর)। হিন্দুশাস্ত্রে চন্দ্রকেও ব্যভিচারী দেবতা রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। ব্যভিচারের দোষে বৃহস্পতিবার শাপে চন্দ্র নাকি যক্ষা রোগগ্রস্ত হয় (ঐ)। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন :—ইন্দ্র যে বর্ষণকারী আকাশ তাহা ভুলিয়া গিয়া তাহাকে স্বয়ং দুঃখের বিধাতা···একটা জীবে পরিণত করিয়াছি।·· বেদের ইন্দ্রাদি দেবতারা কেহবা আকাশ, কেহবা সূর্য, কেহবা অগ্নি, কেহবা নদী এইরূপ অচেতন পদার্থ মাত্র (রচনাবলী : ২য় খণ্ড মাত্র ৭৯১, ৮০০ পৃষ্ঠ)। পরবর্তীকালে বৈষ্ণবরাও শ্রীকৃষ্ণকে সূর্যরূপে কল্পনা করে তাঁর লীলা সঙ্গীরূপে বিভিন্ন তারকাকে উপস্থাপন করেছে। যেমন কৃষ্ণ হল সূর্য প্রতিবিম্ব গোপী তারকা, বিশাখার অপর নাম রাধা। রাধার সখীগণের ভিতরে অনুরাধা (ললিতা) জ্যেষ্ঠা, চিত্রা, ভদ্রা প্রভৃতি রয়েছে (শ্রীরাধার ক্রম-বিকাশ, ১০৪ ও ১০৬ পৃঃ)। যেভাবেই হোক দেবতা রূপে বিভিন্ন সমাজে এই প্রকৃতি পূজা হয়ে আসছে। কুরআন শরীফ পাঠে জানা যায় যে, ইব্রাহীম (আঃ)-এর সমাজ প্রকৃত পূজারী ছিল। তারকা চন্দ্র সূর্যের পূজা করত তারা,। সূর্য ছিল সবচাইতে বড় দেবতা। কুরআনের ভাষায়, হাযা রাব্বি হাযা আকবর (সূরা আনআম)। ইব্রাহীম (আঃ) এই মতবাদের অসারতা প্রমাণ করেন। তিনি ঘোষণা করেন, ইন্না কওমী ইন্নি বারিউম মিম্মা তুশরিকুন অর্থাৎ তিনি চন্দ্র, সূর্য বা নক্ষত্র পূজা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ঘোষণা করেন। উপনিষদও বলেছিলেন তত্র সূর্য, ভাতি ন চন্দ্র তারকং (মুন্ত্রকোপনিষদ, শেতাশ্বতর) অর্থাৎ চন্দ্র, সূর্য তারকা কখনো ঈশ্বর বা স্রষ্টাকে প্রকাশ করতে পারে না। এখানে অনেকে প্রশ্ন করে থাকেন যে মুসলমানরাও তো চন্দ্র দেখে বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠান করে থাকেন। নতুন চাঁদ উঠলে হাত তুলে মোনাজাত করেন। অতএব প্রকারান্তরে এটাও কি এক ধরনের চন্দ্র পূজা নয়? উল্লেখ্য যে, চাঁদ দেখে মোনাজাত করার অর্থ চাঁদকে সম্মান প্রদর্শন নয় বরং

চাঁদের স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্যই এই প্রার্থনা। কেননা তিনি আমাদেরকে আরো একটি নতুন মাস দেখার আয়ু দান করেছেন। তা ছাড়া এই মাস যাতে সবার জন্য কল্যাণকর হয় তারই জন্য এই প্রার্থনা। কুরআন শরীফ বলে—ইয়াস আলুনাকা আনিল আহিল্লাতে কুলহিয়া মাওয়াহিতুলিন্নাসে ওয়াল হাজ্জে—অর্থাৎ প্রশ্নকারীর উত্তরে বলে দাও যে, চাঁদের হিলাল বা কলায় কলায় বৃদ্ধি সাধারণ কাজ কর্মের সুবিধার্থে এবং বিশেষ করে হজ্জ অনুষ্ঠানের সময় নির্ধারণের জন্য (সূরা বাকারা)। অতএব রমযান ও যিলহজ্জের দ্বিতীয়ার চাঁদ দর্শন করে একজন মুসলমান দোয়ার মাধ্যমে সেই ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনেরই সাহায্য যাচ্ঞা করে আল্লাহ্‌তা'লার কাছে। কুরআন স্পষ্ট ভাষায় চন্দ্র সূর্যের পূজা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে (সূরা হামিম সেজদা)। এখানে এও উল্লেখযোগ্য যে, চন্দ্রের হিসাবটিও মূলতঃ সূর্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কেননা সূর্যের আলো পড়েই চন্দ্র দৃশ্যমান হয়। আর এজন্যই কুরআন শরীফ সূর্যকে যিয়া বা মূল জ্যোতিঃ এবং চন্দ্রকে নূর বা সেই জ্যোতির বিকাশ বলছে। বর্ষ গণনায় সূর্যই মূল—কখনো প্রত্যক্ষভাবে এবং কখনো পরোক্ষভাবে একাজে আমাদেরকে সাহায্য করছে।

আমাদের বাংলা সন

আমাদের এই বাংলা সনের জন্মস্থান বাংলার বাইরে দিল্লী নগরীতে। জন্মদাতা সবাই অবাঙ্গালী। জন্মলগ্নে এর নাম ছিল ফসলী সাল। বহু সৈয়্যদ, পাঠান, সিদ্দিকী, কোরেশী বাংলায় এসে যেমন খাঁটী বাঙ্গালী হয়ে গেছেন, তেমনি এককালে দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করে আমাদের আলোচ্য ফসলী সাল বাংলার মাটির পরশে খাঁটী বঙ্গাব্দে পরিণত হয়েছে। মোগলদের রাজকার্য হিজর কমরী বা চান্দ্র বৎসরের হিসাবেই পরিচালিত হত। কিন্তু রাজস্ব আদায়ের দিনক্ষণ পূর্ব থেকে সঠিকভাবে নির্ধারণ করা চান্দ্র হিসাবে সম্ভবপর ছিল না। তাই পণ্ডিত ফতেউল্লাহ্‌ সিরাজীর উপর একটি নূতন সৌরবর্ষ চালু করার দায়িত্ব অর্পণ করা হল। সিরাজী সাহেব দীর্ঘ সাধনার পর ১১ই এপ্রিল ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দ মোতাবেক ২৭শে অথবা ২৮শে রবিউসসানি ৯৬৩ হিজরী কমরী সন থেকে নূতন সৌর ফসলী সনের প্রচলন করেন। মহানবী (সাঃ) ৬২২ খৃষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর তথা ৮ই রবিউল আউয়াল মদীনার উপকণ্ঠে কুবা নামক স্থানে উপনীত হন (তৌফিকাতে এলহামিয়া, মিশর সংস্করণ)। যেহেতু ১লা মহররম ছিল ১৬ই জুলাই, তাই হিজরী সন গণনা শুরু হল এই ১৬ই জুলাই থেকে। দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) পাকাপাকি ভাবে হিজরী কমরী সনের ব্যবহার শুরু করেন (তবারী দ্রষ্টব্য) ৯৬৩ হিজরী কমরী সনের রবিউসসানি পর্যন্ত যে চান্দ্র হিসাবটি চালু ছিল তাতে সৌর হিসাব যুক্ত হয়ে ফসলী সনের যাত্রা শুরু। এই ফসলী সন হিজরী সনেরই চান্দ্র ও সৌর

হিসাবের মিলিত রূপ। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পরবর্তী কালে এই সনটি উপেক্ষিত হওয়ায় এবং শুধু বাংলার মাটিতে এটি গৃহীত হওয়ায় আজ এর নাম বাংলা সন। নানা দেশের নানা মানুষ বাংলার শ্যামল মাটিতে শান্তির আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে, তেমনি এক কালের এই মোগলদের ফসলী সনটিও সর্বত্র উপেক্ষিত হয়ে বাংলাদেশে এসেই স্থান করে নিয়েছে। তাই একে বাংলা সন রূপে অভিহিত করলেই যথার্থ হবে। বাংলা সনে হিজরী সনের গন্ধ থাকায় ভারত সরকার ১৩৬৪ সালে অর্থাৎ ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের ২২শে মার্চ থেকে এটি পরিত্যাগ করে পুনরায় কনিষ্ক প্রবর্তিত শকাব্দ সনের প্রবর্তন করেন। ঐসময় ছিল ১৮৮০ শকাব্দ। ভারত সরকার ১৩৬৩ সালের ৮ই চৈত্র তারিখে ১৮৭৯ শকাব্দের ১লা চৈত্রকে নববর্ষের প্রথম দিন ধার্য করেন। উল্লেখ্য যে, ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে বাংলা সনের জন্মলগ্ন থেকে ছিল ১৪৭৮ শকাব্দের ১লা বৈশাখ। ১৫৫৬ থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত সৌর বৎসর ৪২৮টি, এই সংখ্যা ৯৬৩ এর সাথে যোগ হলে আজকের ১৩৯১ সাল হয়। আর ৯৬৩ এর পর এ পর্যন্ত চান্দ্র বৎসর গত হয়েছে ৪৪ টি। ফলে তার যোগফল হবে ১৪০৪। অর্থাৎ সৌরবর্ষ যোগ হলে হয় আমাদের বাংলা সন আর চান্দ্র বৎসর যুক্ত হলে হয় হিজরী সন। মূলতঃ এই দুটি সনেরই উৎসমূল হিজরতের ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে।

তবলীগ প্রসংগে
সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)-এর
কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ

"হে মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের দাসগণ! এবং হে দীনে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের (প্রেমের) মাতালগণ! এ ধারণাকে পরিত্যাগ করো যে, তোমরা কিইবা করছো আর তোমাদের দায়িত্বে কিইবা ন্যস্ত করা হয়েছে! তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই মুবাল্লেগ (প্রচারক) এবং প্রত্যেককেই খোদার সমীপে জবাবদেহী করতে হবে। তোমাদের যে কোন পেশা হোক না কেন; যে কোন কাজই তোমরা করনা কেন, দুনিয়ার যে কোন অংশে তোমরা বসবাস কর না কেন, যে কোন জাতির সাথে তোমরা সম্পৃক্ত হও না কেন তোমাদের প্রথম কর্তব্য ইহাই যে, দুনিয়াকে মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের দিকে আহ্বান করো আর তাদের মধ্যেকার অন্ধকারকে আলোকে পরিবর্তিত করে দাও এবং তাদের মৃত্যুকে জীবনে রূপান্তরিত করে দাও। আল্লাহ্ করুন যেন এরূপই হয়।" (১৯৮৩ সনের ২৫শে ফেব্রুয়ারী প্রদত্ত জুমুআর খুতবা)

(৪৯ পাতার পর)

তাই অনেকের ধারণা হোসেন শাহ্‌ই নাকি এই বঙ্গাব্দের প্রবর্তক (ইত্তেফাক ১লা বৈশাখ, ১৩৯১)। কিন্তু আসলে তা সত্য নয়। ফতেউল্লাহ্‌ সিরাজী এর মূল প্রবর্তক। আকবরের রাজত্ব কালে এটি উদ্ভাবিত হয়। আকবর চেয়েছিলেন তার নবধর্মের স্মরণে এলাহি সন চালু করতে। কিন্তু তা সর্বসাধারণ্যে গৃহীত হয়নি। তৎপরিবর্তে নূতন সৌর ফসলী সনই গৃহীত হল সকলের কাছে নির্বিবাদে। অধুনা বাংলাদেশে প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ যে নববর্ষ উদযাপিত হয়, যার উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, শতবর্ষ আগেও আমরা তার কোন সন্ধান খুঁজে পাই না। ১লা বৈশাখকে ছুটি হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে পাকিস্তান আমলে। অতীতে বাংলাদেশে ৩০শা চৈত্র এবং ১লা বৈশাখ দিন দু'টি ব্যবসায়িক কাজকর্মে ব্যবহৃত হত, ঐ সময়ে ব্যবসায়ীরা তাদের হিসাব নিকাশের হালখাতা করত। হালখাতা অর্থ দেনা পাওনাকে আপ্‌টুডেট করে নেওয়া। এই উপলক্ষ্যে বাকী আদায়ের যেমন চেষ্টা চলত তেমনি নূতন পুঁজি সংগ্রহের জন্যও অগ্রিম ডিপোজিট গ্রহণ করা হত। তাছাড়া ক্রেতা-বিক্রেতার শুভেচ্ছাও বিনিময় হত এই দিনে। আজো এই রীতি চালু আছে। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীরা এই দিনটিকে গুরুত্ব সহকারে পালন করে আসছে। হিন্দুরা ঐদিন দোকান ঘর পরিষ্কার করে গঙ্গাজল ছিটিয়ে কলাগাছ পুঁতে ঘট নারিকেল সাজিয়ে সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে নূতন খাতার মহরত করে তৎসঙ্গে চলে সিদ্ধিদাতা গনেশ আর লক্ষ্মীর পূজো। অপর দিকে মুসলমান ব্যবসায়ীরা আতর গোলাপ ছিটিয়ে, আগর বাতি জ্বালিয়ে মিলাদের আয়োজন করে নূতন বৎসরের ব্যবসায় বরকত লাভের আশায়। মিষ্টি বিতরণের প্রচলন উভয় সম্প্রদায়েই বিদ্যমান রয়েছে। আধুনিক বড় বড় শিল্পকারখানার মহাজনেরা কিন্তু আবার এসব সেকেলে পদ্ধতি পসন্দ করেন না। তারা তাদের ব্যবসা পরিচালনা করেন পুঁজিবাদী ইউরোপীয় কায়দায়। রাজধানীসহ বড় বড় শহরগুলিতে বুদ্ধিজীবীরা নববর্ষ পালনের পদ্ধতিকেও পাশ্চাত্যের নববর্ষ উদযাপন রীতির অনুকরণ অনুসরণে চালু করেছেন। গ্রামের বৃহত্তর জনগোষ্ঠি এহেন রীতির সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত। সৌর হিসাবে বর্তমান নববর্ষগুলি প্রকৃতির এক বিশেষরূপে আবির্ভূত হয়। ১লা জানুয়ারী ইউরোপ আমেরিকার বহু দেশে তুষারপাতে যখন মানুষের জীবন যাত্রা ব্যাহত করে তুলে তখন উদযাপিত হয় এই নবীনবরণ উৎসব। অপরদিকে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড খরাতাপদগ্ধ পরিবেশে আবির্ভূত হয় ১লা বৈশাখ যখন চারিদিকে ঘটতে থাকে কালবৈশাখীর তাণ্ডব। আকাশে কালো মেঘ দেখলে সাধারণ চাষীর অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে, ক্ষুধার অন্ন তখন মাঠের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মুক্ত আকাশের নীচে। যে কোন মুহূর্তে কাল বৈশাখীর নির্মম ঝাপটায় সাধের সেই ফসল মাটীতে মিশে যেতে পারে। তাই তাদের আনন্দ করার ফুরসত কোথায়? ১লা বৈশাখের আনন্দ তো কেবল নাগরিক জীবনেই সীমাবদ্ধ। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা এতে নিত্য নূতন কিছু সংযোজন করে চলেছেন। এদেশে ঐ ব্যবসায়ীরাই বিভিন্ন সময় এবং তারিখকে ব্যবসায়ী কাজে ব্যবহার করেছেন সব সময়। আজকে মাস পয়লা তাই বাকী দেওয়া যাবে না, আজ সংক্রান্তি, এইমাত্র সন্ধ্যা বাতি দিলাম তাই বাকী দেওয়া যাবে না। এটা বাকির ফাঁকি থেকে বাঁচার জন্য একটা বাহানা মাত্র। জমিদারী যুগ পুন্যাহ্‌ অনুষ্ঠানও ছিল হালখাতা ধরনের একটা আর্থিক অনুষ্ঠান মাত্র। (নির্বাহী সম্পাদক)।

সম্পাদকীয় ঃ

নববর্ষ

নববর্ষ পালনের রীতি এখন কমবেশী সব দেশেই প্রচলিত হয়ে গেছে। ইংরেজী (এদেশে ইংরেজ দ্বারা প্রচলিত সন) নববর্ষের ইতিহাস আলোচনা করলে জানা যায় যে ৪৬ খৃঃ পূর্বে জুলিয়াস সীজার যখন বাৎসরিক কেলেণ্ডার পরিবর্তন করেন তখন থেকে এক কালের দ্বাদশ মাস জানুয়ারী বৎসরের প্রথম মাসরূপে গণ্য হয়ে আসছে। ইংলণ্ড বিজয়ী উইলিয়াম ১লা জানুয়ারী থেকে নববর্ষ চালু করেন ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে। এর আগ পর্যন্ত ২৫শে মার্চ ছিল নববর্ষের প্রথম দিন। পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরী ১৫৮১-৮২ সালে এই বর্ষপঞ্জির সংস্কার করেন। ১৯১১ সাল থেকে চীনে ১লা জানুয়ারী নববর্ষ রূপে স্বীকৃতি পায় (বহুরূপে দেবতা তুমি)। অতি প্রাচীন কাল থেকে পারশ্যে নববর্ষে নওরোজ পালনের প্রথা চালু আছে। বর্তমানেও শিয়ারা এই দিবসটি জাঁকজমকের সাথে পালন করে। পারশ্য বংশোদ্ভূত ভারতীয় রাজা বাদশারাও ঘটা করে নওরোজ উৎসব পালন করতেন। কারো কারো ধারণা এই দিনে হযরত সোলায়মান তাঁর হারানো আংটী ফিরে পেয়েছিলেন। ইরানে শেখিয়া শিয়া পরিবেশে জন্মগ্রহণকারী ধর্মমত বাবী ও বাহাই মতে ১লা মার্চ থেকে তাদের নওরোজ বা নববর্ষ শুরু হয়। শিয়াদের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ তোহফাতুল আউয়াম-এ বলা হয়েছে, "নওরোজ সেইদিন যেদিন সূর্য মেষ রাশিতে প্রবেশ করে সৌর হিসাবে সেই দিন ২১শে মার্চ।" এই দিন পরস্পরের প্রতি পানি ছিটান হয়। সবাই গোসল করে। অনেকের মতে এই তারিখে হযরত আলী (রাঃ) রসূল করীম (সাঃ-এর কাঁধে উঠে কাবা ঘরের মূর্তি ভেঙ্গে ছিলেন। এই তারিখটিকে শিয়ারা ঈদে গাদির নামেও অভিহিত করে। তাদের মতে এই ঈদ সর্বশ্রেষ্ঠ ঈদ। ওই দিনে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত আলীকে (রাঃ) তাঁর আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার প্রদান করেন এবং আলীর (রাঃ) বংশে ইমামতের ধারাকে চালু করেন। এই দিনটি 'গাদিরে খোম' দিবস রূপেও পরিচিত। শিয়াদের হিসাবে ২১শে মার্চ ৬৩২ খৃষ্টাব্দ মোতাবেক ১০ হিজরীর ১৮ই জিলহজ্জ যোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে এই ঘটনাটি ঘটেছিল। শিয়ারা বলেন, ঐ থেকে নবুওতের যামানার সমাপ্তি এবং মাওলাইয়াত বা ইমামতের যামানার শুরু। তাই এটি একটি নূতন দিন বা নওরোজ। তারা এও বলেন, এই তারিখে হযরত আলী (রাঃ) খেলাফতের জাহেরী গদীতে সমাসীন হয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, শিয়ারা খেলাফতকে খুব ভাল চোখে দেখে না। এই তারিখে নাকি খারিজিদের বিরুদ্ধে নেহেরওয়ান যুদ্ধেও জয়লাভ হয়েছিল। তাদের মতে এই তারিখেই ইমাম মাহদী (আঃ) জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করবেন। ভূগোল বেত্তাদের হিসাব মতে ২৩শে মার্চ দিন ও রাত সমান হয়ে থাকে। দুর প্রাচ্যের এলাকায় আজো চন্দ্রের হিসাবে একটি নববর্ষ পালিত হয়ে থাকে। ভিয়েতনামের যুদ্ধে আমরা এই চান্দ্র নববর্ষে ক্ষণিকের জন্যে হলেও যুদ্ধবিরতি পালিত হতে দেখেছি।

আমাদের দেশে খৃঃ পূর্ব ৪৫০০ অব্দে শরৎ বর্ষের প্রথম মাস ছিল অগ্রহায়ণ। ২৫০০ খৃঃ পূর্বে কার্ত্তিক হয় প্রথম মাস। ১৯৯৩ খৃঃ পূর্বে আশ্বিনের শুক্লা দশমীতে নববর্ষ শুরু হত। ১লা বৈশাখ থেকে বঙ্গাব্দের নববর্ষ গণিত হয়ে আসছে ৭৮ খৃষ্টাব্দ থেকে। ভারত সরকার তাদের সরকারী সন শকাব্দের ১লা চৈত্রকে নববর্ষের প্রথম দিন ধার্য করেন।

অনেকের মতে মধ্য যুগের বাংলাদেশে সুলতান হোসেন শাহের আমল থেকেই নাকি বাংলাদেশে বাংলা সনের আবির্ভাব।

(অবশিষ্টাংশ ৪৮ পাতায় দেখুন)

15th April, 1994

আহ্‌মদী

রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেনঃ

"আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরী'অত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলায়হিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা এবং তাঁহার রসূল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুযুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাক্‌ওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীনা—"

অর্থাৎ সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

(আইয়ামুস সুলাহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
দূরালাপনীঃ ৫০১৩৭৯, ৫০২২৯৫

সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান
নির্বাহী সম্পাদক ঃ আলহাজ এ, টি, চৌধুরী

Published & Printed by Mohammad F.K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the p oprietors, Ahmadiyya Muslim Jamat, Bangladesh
4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 502295

Editor : Moqbul Ahmad Khan
Executive Editor : Alhaj A. T. Chowdhury